গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প

Girischandra Ghosh Lectures

গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৯৪২

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, 48, HAZRA ROAD, CALCUTTA

Reg. No. 1407B—July, 1942—E

উৎসর্গ

গিরিশচন্দ্র স্মরণে

সূচী

নিবেদন

ভগ্নস্বাস্থ্যে বৃদ্ধবয়সে যখন সমস্ত কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমন্ত্রণ পাইলাম। সে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম, কারণ আমার দৃষ্টিতে শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বহুবৎসর আমি তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়াছি; সেইজন্য আমার নিকট তিনি যেরূপভাবে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহারই যৎসামান্য এই বক্তৃতায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর যখন বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল তখন অপরাহ্ণে প্রায় নিত্যই স্বামী যোগানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও আমি গিরিশচন্দ্রের গৃহে যাতায়াত করিতাম। সেই সময় তাঁহার ঘরে বহুবিধ উচ্চাঙ্গের কথোপকথন হইত। সেই সকল আলোচনা যদি লিপিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যে কয়েকখণ্ড মূল্যবান্ গ্রন্থ বিরাজ করিত। সেই মধুর-স্মৃতি আজও আমার ভিতর সম্যক্ জাগ্রত আছে, কিন্তু সকল কথাবার্ত্তা ঠিক স্মরণ নাই।

বহুদিন পূর্ব্বে আমি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে একখানি পাণ্ডুলিপি অসম্পূর্ণরূপে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই পাণ্ডুলিপিখানি আমার পরমস্নেহের পাত্র শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে

প্রদান করি, কারণ বর্ত্তমানে আমি শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ। বসন্তকুমার সেই বিরাট পাণ্ডুলিপিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ বর্ত্তমান বক্তৃতা এবং অন্য অংশ 'গিরিশ-স্মৃতি' নামে প্রণয়ন করিয়া দেন। এই পুস্তক বিরচনকালে বসন্তকুমার যথেষ্ট ধীশক্তি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বজনপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, কারণ তিনিই এ-বিষয়ে অগ্রণী এবং আমার অনুপস্থিতিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বক্তৃতা সর্ব্বজন-সমক্ষে পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল ও শ্রীত্রিলোচন সিংহ মহাশয়দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, কারণ তাঁহারাও লিপিকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা।
৯ই চৈত্র, ১৩৪৮

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রাগবাণী

দর্শনশাস্ত্রে তর্কযুক্তি দ্বারা উচ্চভাবসকল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মনস্তত্ত্বের নানারূপ ভাব ও অবস্থা, প্রমাণ ও যুক্তি সাহায্যে দার্শনিক নিজ মত স্থাপন করিয়া থাকেন। সেইজন্য দর্শনশাস্ত্রে নানাবিধ মতবাদ ও নানাপ্রকার শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র অতীব জটিল ও স্বল্প-সংখ্যক ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য প্রণীত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য সেই সকল শাস্ত্র কাব্যরূপে রচিত হয়। নায়ক ও নায়িকার বাক্যালাপের ভিতর দিয়া মনস্তত্ত্বের নানা স্তর, পরিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি পরিদর্শিত হয়। কাব্যে বহু-প্রকার চরিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে এবং সেই সকল চরিত্র বহুপ্রকার বাক্যালাপ ও বিপর্য্যস্ত ভাব প্রদর্শন করিয়া মনস্তত্ত্বের নানারূপ পরিবর্ত্তন প্রকাশ করিয়া থাকে। দৃশ্যমান চরিত্র ও সাধারণ ভাব থাকায় জনসাধারণের পক্ষে কাব্য বুঝিবার অনেক সুবিধা হয়। এইরূপে কাব্য, উদাহরণ ও চরিত্র দিয়া বর্ণিত হওয়ায় দর্শনশাস্ত্রের একটি ভাব প্রদর্শিত হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা, বেশভূষা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কাব্যে বর্ণিত হইয়া থাকে। সমাজের কি অবস্থা, কিরূপে সেই অবস্থা আসিল এবং তাহার পরিণতি কি হইবে তাহাও কাব্যে পরিদর্শন করিতে হয়। এইজন্য ইতিহাস ও সমাজের সহিত কাব্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নিত্য যাহা দেখা যায়

তাহা কাব্য নহে। সকল ব্যক্তিই প্রতিদিন সাধারণভাবে অনেক কিছু ঘটনা দেখিয়া থাকে এবং ইহার উপর অনেক কিছু বাগ্-বিতণ্ডা হয়; কিন্তু কাব্য হইল অন্যবিধ। জন-সাধারণের মনকে উচ্চস্তরে প্রধাবিত করাই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কাব্যে মাধুর্য্য এক বিশেষ অঙ্গ। বাক্যালাপের ভিতর মাধুর্য্য বিশেষভাবে থাকিবে। সব সময় একই প্রকার চরিত্র ও ভাব থাকিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়. সেইজন্য নানাপ্রকার ভাব ও বিপরীত ভাব সংযোগ করিয়া মাধুর্য্য বর্দ্ধন করিতে হয়। ইহা হইল অলঙ্কারের বিষয়। অলঙ্কারশাস্ত্র ভাষায় মাধুর্য্য সংযোগ করে। বাক্যালাপের ভিতর ও চরিত্রের মুখ দিয়া নানাপ্রকার অলঙ্কার দেখাইতে হয়। ন্যায় ও তর্কশাস্ত্র যেমন কঠোর যুক্তি দিয়া অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করে—কেবলমাত্র ধীশক্তিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, তেমনি অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল অল্প সময়ের মধ্যে শ্রোতার মনকে কি করিয়া অভিভূত করিবে। নানাপ্রকার ভাব, ভাষা ও শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা কিরূপে শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করা যায়, কিরূপে শীঘ্র আলোড়িত ও অভিভূত করা যায়, ইহাই হইল অলঙ্কার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সেইজন্য কাব্যের ভিতর বহুপ্রকার ভাব আছে; যথা, প্রথম—দার্শনিক, দ্বিতীয়—ঐতিহাসিক, তৃতীয়—সামাজিক, চতুর্থ—মাধুর্য্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল উপদেষ্টার ভাব। সমাজে কি করিয়া অলক্ষিতভাবে উপদেশ দিতে হয় এবং কি করিয়া সমাজের মনকে উচ্চস্তরে লইয়া যাওয়া যায়, ইহাই হইল উদ্দেশ্য। ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায়, শিষ্য গুরুর কাছে সংযতভাবে বসিয়া উপদেশ শ্রবণ ও

গ্রহণ করেন, কিন্তু কাব্যের হইল অন্য প্রথা। কান্তা স্বামীর নিকট বসিয়া কঠোর সংযত ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্নেহ, মাধুর্য্য, চাপল্য ও নানাপ্রকার ভাবের ভিতর দিয়া উচ্চভাব অশঙ্কিত-চিত্তে গ্রহণ করেন। উচ্চভাব বিকিরণ করা উভয় শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য, তবে পন্থা হইল বিভিন্ন। একটি হইল গভীর সংযত ভাব; অন্যটি হইল মাধুর্য্যময়, স্নেহময় ও প্রেমময়—হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়া সেই একই ভাব গ্রহণ করা। এইজন্য কাব্য দর্শন ও শ্রবণ করিতে বহু-সংখ্যক লোক গমন করিয়া থাকে। সৎ-কাব্যের ভিতর ধর্ম্ম-উপদেষ্টার, দার্শনিকের, বৈয়াকরণিকের এবং আলঙ্কারিকের ভাবও থাকিবে। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক ভাব এবং ভবিষ্যতে সমাজের জটিল প্রশ্নসকল কিরূপে সমাধান করিতে হইবে তাহাও থাকিবে। এইজন্য সু-কাব্যের ভিতর অনেকভাব প্রদর্শন করিতে হয়, কিন্তু সমস্ত ভাবগুলি প্রচ্ছন্ন ও অলক্ষিতভাবে থাকিবে। ইহাই হইল কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। এই সকল গুণের বিপর্য্যস্তভাব থাকিলে কাব্য দূষণীয় হয়। কাব্যে একদিকে যেমন চাপল্য ও হাস্যোদ্দীপক ভাব থাকিবে, অন্যদিকে তেমনি গম্ভীর উপদেষ্টার ভাবও থাকিবে। প্রকৃত-কবির আসন অতি উচ্চস্তরে। তিনি সমাজের নিয়ন্তা ও উপদেষ্টা। তাঁহার উপদেশ যেন সকলে গ্রহণ করিতে পারে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে, এই ভাবটি অলক্ষিতভাবে প্রকাশ করিতে হয়। জগতে বহুবিধ কাব্য রচিত হইয়া থাকে কিন্তু অল্প-সংখ্যক কাব্য চিরস্থায়ী হয়। কাব্যের উদ্দেশ্য কেবল হাস্য-কৌতুক নয়, দার্শনিক ও উপদেষ্টার ভাব উহাতে বিশেষভাবে থাকিবে। দার্শনিকের কঠোর ভাব পরিত্যাগ করিয়া মাধুর্য্যপূর্ণ-ভাবে

সেই সকল উপদেশ প্রদান করিতে হয় অর্থাৎ দর্শন-শাস্ত্রকে মাধুর্য্য দিয়া প্রকাশ করাই কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। সমাজের অনেক বিষয় যাহা সাধারণ লোকচক্ষুতে প্রতিভাত হয় না, দার্শনিক তাহা অনুধাবন করিয়া মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ ভাষায় চরিত্রের মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইজন্য কবি হইল দার্শনিক, উপদেষ্টা ও মধুরভাষী। এই সকল গুণ কাব্যে না থাকিলে কাব্যের ভিতর চাপল্য আসিয়া যায় এবং সমাজ তাহা গ্রহণ করে না।

কাব্যকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী হইল—শ্রব্য-কাব্য, দ্বিতীয় শ্রেণী হইল —দৃশ্য-কাব্য। শ্রব্য-কাব্য সাধারণতঃ তিন প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীতে আমরা দেখিতে পাই যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে আখ্যায়িকামূলক কাব্য (Narrative Epic) রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ, গ্রীস ও পরবর্ত্তীকালে পারস্য দেশে এই প্রকার আখ্যায়িকামূলক কাব্য রচিত হয়। আখ্যায়িকামূলক কাব্যে জাতির ইতিহাস, সমাজ, আচার-পদ্ধতি, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, বিধি-নিয়ম, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। এইরূপ গ্রন্থে ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহা হইল জাতির প্রাণ-স্বরূপ গ্রন্থ। যদিও প্রচীনকালে ইতিহাসের স্বতন্ত্রভাবে প্রণয়ন-প্রথা ছিল না, তথাপি আখ্যায়িকাপূর্ণ গ্রন্থে জাতির প্রাণ, প্রগতি ও উত্থান প্রভৃতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইত। সেইজন্য এই সকল গ্রন্থ জনসমাজে অত্যন্ত আদরণীয়। আখ্যায়িকাপূর্ণ কাব্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। মহাকাব্যে সমগ্র জাতির

প্রচেষ্টা কোন এক বংশকে অবলম্বন করিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। জাতির সমস্ত ভাবরাশি, আচার-পদ্ধতি ইত্যাদি যাবতীয় ভাব মহাকাব্যে বর্ণিত বা প্রদর্শিত হয়।

খণ্ডকাব্যে কোন এক ব্যক্তি বা কোন একটি বিশেষ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করা হয়। মহাকাব্যে সমগ্র জাতির বিষয় এবং সেই জাতির সহিত অপর জাতির কি সম্পর্ক তাহা দেখাইতে হয়। যদিও খণ্ডকাব্যে একটি ব্যক্তি বা একটি বিশেষ উপাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয় তথাপি উভয়ের উদ্দেশ্য একই প্রকার। ইহাকে ইতিহাস বা দর্শনশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থে অতি গম্ভীরভাব থাকে। সামাজিক বা দাম্পত্য-সম্পর্কে যাহাই বর্ণিত হইবে তাহাই অতি গম্ভীরভাবে প্রদর্শিত হয়। এইজন্য এই সকল গ্রন্থ কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হয়। কোন জাতিকে জাগাইতে হইলে মহাকাব্য প্রণয়ন করিতে হয়। ভারতবর্ষে নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাবাত হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, ভাষারও অনেক তারতম্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থ সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যদি রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইখানি গ্রন্থ না থাকিত তাহা হইলে হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ লোপ পাইয়া যাইত। প্রাণ-স্বরূপ হইয়া এই দুই বিরাট্‌ গ্রন্থ হিন্দুজাতিকে আজও রক্ষা করিতেছে।

গ্রীকদিগের হোমার (Homer) বিরচিত ইলিয়াড (Iliad) ও ওডেসি (Odyssey) এই দুই গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাচীন গ্রীক-জাতির ভিতর প্রাণসঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায়

গ্রীকজাতির উপরও অনেক ঝঞ্ঝাবাত আসিয়াছিল, কিন্তু হোমার-বিরচিত গ্রন্থদ্বয় গ্রীকজাতিকে পুনরভ্যুত্থানের প্রয়াসে সাহায্য করিতেছে। পারস্য দেশে ফারদৌসি (Ferdousi)-বিরচিত "শাহ্‌নামা" (Shahnama) প্রাচীন পারস্যজাতির ভিতর শক্তিসঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে। পারস্যজাতি নানারূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আজও জীবিত আছে ইহার কারণ তাহারা 'শাহ্‌নামা'কে প্রাণ দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ইতিহাসে নীরসভাবে জাতির ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়, সেইজন্য ইহা সকলের পাঠ্য ও প্রীতিকর নহে; কিন্তু মহাকাব্য সকলেরই প্রীতিকর।

কখন কখন বা জাতীয় ইতিহাস ছন্দে লিখিত হয়— যেমন রাজতরঙ্গিণী। কিন্তু ইহা মহাকাব্য নহে। মহাকাব্যের ভিতর বিশেষভাবে কবিত্বশক্তি দেখাইতে হয়; যেন অল্পের ভিতর সমস্ত বিষয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং তাহাতে একটা উচ্চভাব আসে। জাতির মনকে স্নেহপূর্ণভাবে উচ্চদিকে লইয়া যাওয়াই হইল মহাকাব্যের উদ্দেশ্য।

বর্ণনামূলক-কাব্য প্রথম শ্রেণী হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক্, কিন্তু কতক পরিমাণে উভয়ের সৌসাদৃশ্যও আছে। এই শ্রেণীর কাব্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা অধিক হইয়া থাকে। যদিও একটা বংশ বা এক ব্যক্তির উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ইহার বর্ণনা হয়, তথাপি বর্ণনাকালে গৃহাদি, নগর, উদ্যান, পর্ব্বত ইত্যাদির বর্ণনাও বহুল পরিমাণে থাকে। আখ্যায়িকাপূর্ণ কাব্যে যেমন জাতির প্রচেষ্টা দেখানই হইল কাব্যের কেন্দ্রস্থল, তেমনি বর্ণনামূলক কাব্যের (Descriptive Epic) প্রধান অঙ্গ হইল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখান। এইজন্য ইহাকে দ্বিতীয়

শ্রেণীর কাব্য বলা হয়। অর্থাৎ ইহাতে রাজা বা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির চিত্তবিনোদনার্থ প্রমোদ-কানন, বন, উপবন ইত্যাদি বর্ণনা এবং মৃগয়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের কথা বহুল পরিমাণে থাকে। ইহাতে ঠিক জাতির মনোভাব প্রদর্শিত হয় না, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়—চিত্রকর যেন সেই সকল বর্ণনা হইতে অনায়াসে চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে। কিন্তু দার্শনিকভাব, শক্তিপূর্ণ গম্ভীরভাব বা জাতির গতির ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ তদ্রূপ থাকে না। এই সকল কাব্যে গাম্ভীর্য্য-ভাব হইতে অনেক স্থলে চাপল্য-ভাব আসিয়া থাকে; সেইজন্য ইহাকে জাতির প্রাণ বলা যায় না, যদিও অপর সকল অংশ অল্পবিস্তর সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহাকে জাতির দেশজ-চিত্র বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য হইল নাটকীয় মহাকাব্য বা Dramatic Epic। ইহা হইল আধুনিক প্রথা। প্রাচীনকালে এরূপ প্রথা ছিল না। এইরূপ মহাকাব্যে নায়ক বা নায়িকা এরূপভাবে বাক্যালাপ করিবে যে, সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই উহা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা যাইতে পারে।

নাটকে অভিনয়-নির্দ্দেশ (Stage Direction) অতি সংক্ষেপে হইয়া থাকে এবং অভিনেতৃগণ ইচ্ছামত এই অংশ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। নাটকীয় মহাকাব্যে এই নির্দ্দেশের অংশটুকু বর্ণনা করিয়া লিখিত হয়। ইহাতে বেশভূষা, স্থান, সময় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু অভিনয়কালে এই অংশটুকু পরিত্যাগ করিতে হয়; কেবল চরিত্রসকল পরস্পর কথোপকথন করিবে এইমাত্র থাকিবে। চরিত্রসকল এইরূপভাবে অঙ্কিত করিতে হইবে

যেন পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। নাটক ও নাটকীয় মহাকাব্যে এইমাত্র প্রভেদ বলা যাইতে পারে যে, নাটকীয় মহাকাব্যে বর্ণনার অংশ থাকিবে, কিন্তু নাটকে বর্ণনার অংশ অভিনয়-নির্দ্দেশের ভিতরে হইবে। নাটকের প্রত্যেক চরিত্র নিজ নিজ ভাবে ও সামাজিক মর্য্যাদা অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করিবে। প্রত্যেক চরিত্র নিজের গ্রাম ও সমাজের স্তর অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করিবে; এমন কি স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগ করিবে। কিন্তু নাটকীয় মহাকাব্যে সকল চরিত্রই এক প্রকার ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে এবং তাহা গম্ভীর হওয়াই আবশ্যক; চাপল্য বা বিদূষকের ভাব বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য নাটক ও নাটকীয় মহাকাব্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। নাটকীয় মহাকাব্যে ধীর ও শান্ত ভাবে চরিত্রসকল অল্পে অল্পে কথোপকথন করিবে, নাটকে কিন্তু চরিত্রসকল অতি দ্রুতবেগে কথোপকথন করিবে এবং লোমহর্ষণ, ব্যগ্র ও চাঞ্চল্যপ্রদ ভাব আনিবার চেষ্টা করিবে। একটিতে চরিত্রসকল যেন স্তরে স্তরে তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে যেন ভাব উদ্ঘাটন করিতেছে। অপরটিতে দ্রুতগতিতে ও চঞ্চল-ভাবে চরিত্রসকল আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। নাটকীয় মহাকাব্যে এত দ্রুতগতিতে চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না। চরিত্র নিজের মনোভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ করিবে, অতিশয় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিবে না। ইহাই হইল উভয় শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ পার্থক্য।

সাধারণতঃ কাব্য-শ্রেণীকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—আখ্যায়িকাপূর্ণ-কাব্য বা Narrative Epic

বর্ণনামূলক-কাব্য বা Descriptive Epic এবং নাটকীয় মহাকাব্য বা Dramatic Epic। ইহাই হইল সাধারণ লক্ষণ।

পূর্ব্বে শ্রব্য-কাব্যের কথা বলা হইয়াছে। ইহাকে মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দৃশ্য-কাব্যের উদ্দেশ্য হইল কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের কোন এক বিশেষ ঘটনা প্রদর্শন করা। এইজন্য ইহাকে খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। দৃশ্যকাব্য অনেক প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীকে হাস্যোদ্দীপক বা প্রণয়পূর্ণ মিলনাত্মক-কাব্য (Comedy) বলা যায়। ইহাতে যদিও কখন কখন মধ্যস্থলে বিচ্ছেদের ভাব থাকে, তথাপি পরিণতি ও সমাপ্তিতে সকলেই হাস্যমুখে একত্রিত হয়। ভারতবর্ষীয় কাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহাতে সকলের একসঙ্গে মিলনের ভাবটি প্রণোদিত হইত।

বিয়োগান্ত বা Tragedyর ভাবে নাটক গ্রাক্-জাতির ভিতর প্রথম রচিত হয়। Tragos শব্দটির অর্থ "পাঁঠা"। Tragedy শব্দের অর্থ হইল—"পাঁঠাবলির পালা-গান।" Tragedy অর্থে পাঁঠা বুঝায়—ইহা এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল: গ্রীক্-জাতি সম্রাট্‌কে Tyrant বলিত। Tyrant বা একচ্ছত্র সম্রাট্‌রা মহা-অত্যাচারী হইয়া'ছিল, সেইজন্য Tyrant শব্দটা কদর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। রাজার অত্যাচারের বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে পাছে নিজে রাজকোপে পতিত হন, সেইজন্য নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঘটনাও কিঞ্চিৎ অদল-বদল করিয়া কবি কাব্য রচনা করিতেন। সেই পালা-গান শুনিয়া বিষয়-বস্তুর উদ্দেশ্যটা সাধারণ লোকে কিন্তু ঠিকই বুঝিতে পারিত

—ইহাতে কবির উদ্দেশ্য সফল হইত। এই গ্রন্থে Nemesis বা দুষ্ট-সরস্বতীর এক চরিত্র থাকিত। প্রথম অবস্থায় এক অত্যাচারী ব্যক্তি নানাপ্রকার কু-কর্ম্ম করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহার অত্যাচার ও কু-কর্ম্ম বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে দুস্ট সরস্বতী তাহাকে আশ্রয় করিল, এবং আরও নানাপ্রকার কু-কর্ম্মে প্রোৎসাহিত করিয়া পরিশেষে কঠোর শাস্তি দিয়া বিপদে ফেলিল, অর্থাৎ তাহার কু-কর্ম্মের উপযুক্ত দণ্ড হইল। এইজন্য দুষ্ট-সরস্বতীর কথাবার্ত্তা আবশ্যক হইত, কিন্তু অভিনয়কালে পাছে দুষ্ট সরস্বতীর প্রকোপ অভিনেতার উপর পড়ে সেইজন্য একটি পাঁঠা বলি দিয়া দুস্ট-সরস্বতীর প্রকোপ উপশম করা হইত। সেইজন্য এইরূপ পালা-গানকে লোকে পাঁঠাবলির পালা-গান বলিত। ইহাই হইল গ্রীক্-দিগের Tragedy লিখনের উৎপত্তির ইতিহাস।

তখন বর্ত্তমানকালের ন্যায় অভিনয়-প্রথা ছিল না। একটা গাছের তলায় বা মাঠের মাঝে একটা মঞ্চ বাঁধিয়া লেখক নিজে তাঁহার পালা-গান পড়িতেন এবং শ্রোতৃবৃন্দ মাঠে বসিয়া তাহা শুনিত। গ্রীসদেশ পর্ব্বতশ্রেণীতে পরিপূর্ণ; সেইজন্য অভিনয়-শ্রবণকালে কতক ব্যক্তি নাবাল বা নিম্নজমিতে বসিত এবং কতক ব্যক্তি পর্ব্বতের গায়ে বসিত। সেইজন্য অদ্যাপি রঙ্গমঞ্চের বসিবার স্থানকে Pit (নাবাল স্থান) ও Gallery (উচ্চ স্থান) বলা হয়। রোমানদিগের Gladiatorদের ক্রিয়া দর্শনের জন্য ঠিক এই উদ্দেশ্যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত; ইহাকে Arena ও Gallery বলা হইত। অভিনয়কালে দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন হইত না। এই সামান্য প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমানে বহুপ্রকার Tragedyর উৎপত্তি

হইয়াছে। আধুনিক Tragedy কাব্য অন্য প্রকার। ইহাতে দুষ্কর্ম্মের পরিণতি দেখান হয় এবং গ্রন্থের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে একটা শোকের ও বিচ্ছেদের ভাব ফুটিয়া উঠে। Comedy বা মিলন-কাব্য যেমন বহুপ্রকার হইতে পারে, Tragedy-কাব্যও সেইরূপ বহুপ্রকার হইয়া থাকে কোন বিশেষ বিধি-নিয়ম এস্থলে চলে না।

এই দুই গ্রন্থ বা ধারা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক নাটক বর্ণিত হয়। ইহাতেও পূর্ব্বোল্লিখিত দুই শ্রেণীর ভাব প্রদর্শন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত আধুনিককালে রচয়িতার অভিপ্রায়-অনুযায়ী ও দর্শকের মনোভাব-অনুযায়ী বহুপ্রকার নাটক রচিত হইতেছে। এই সকল নাটককে কোন বিশেষ বিধি-নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না। ইহাদের কেবলমাত্র একটি লক্ষ্য যে অল্প সময়ের মধ্যে দর্শকের মনকে অভিভূত করিয়া বক্তব্য বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা; এইটি হইল আধুনিক নাটকের প্রধান লক্ষণ। ভারতীয় ও গ্রীকদিগের পুরাতন নাটকের যে সকল লক্ষণ ছিল, এখন তাহা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে; সেইজন্য আধুনিক নাটক পুরাতন নিয়ম-অনুযায়ী রচিত হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দৃশ্য কাব্যের প্রধান অঙ্গ হইল বর্ণিত বিষয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। যেমন শ্রব্য-কাব্য পাঠ করিয়া পাঠকদের তৃপ্তিসাধন হয়, তেমন দৃশ্য-কাব্যের বর্ণিত চরিত্রসকল— নায়ক, নায়িকা প্রভৃতি—স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া সেই সকল বিষয়ে কথোপকথন করিয়া থাকে, ঠিক যেন বর্ণিত ঘটনাসকল প্রত্যক্ষ ও সম্মুখীন হইতেছে। এইস্থলে বর্ণনার পারিপাট্য যেমন আবশ্যক, চরিত্রগুলি প্রদর্শন করাও তদ্রূপ আবশ্যক। চরিত্র প্রদর্শন

করাকে অভিনয় বলে। গ্রন্থের সাফল্য অনেক পরিমাণে অভিনয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এইস্থলে দৃশ্য-কাব্য ও শ্রব্য-কাব্যের পার্থক্য দেখা গেল।

কাব্যে অধিষ্ঠান (Pose) আবশ্যক। কোন্ ব্যক্তি কিরূপভাবে অধিষ্ঠিত হইবে—বসিবে, দাঁড়াইবে, হাত কিরূপ-ভাবে রাখিবে, কটিদেশ কিরূপভাবে বক্র করিবে, এই সকল অধিষ্ঠান রাখা বিশেষভাবে আবশ্যক। কারণ শরীরের নানারূপ অঙ্গ সঞ্চালনের উপর মনের ভাব প্রকাশ নির্ভর করে। এই অধিষ্ঠান হইল প্রধান কেন্দ্র। কারণ. মূক-অভিনয়ে (Pantomime) কোন শব্দ উচ্চারণ করিবে না, কেবল হস্তাদি সঞ্চালন ও মুখভঙ্গি করিয়া সমস্ত বিষয়টি বর্ণনা করিবে। Tableau অভিনয় এই প্রকারে হইয়া থাকে। আমি যখন বুলগেরিয়া হইতে রুমেনিয়ায় ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন দানুব নদীর তীরে রোসতুক্ (Rostuchuck) শহরের এক Café Chantan-এ এই অভিনয় দেখিয়াছিলাম। দুইজন বৃদ্ধা, একজন পুরুষ ও আর একজন নারী সাজিয়াছিল। তাহারা যখন হস্ত সঞ্চালন করিয়া অভিনয় করিতে লাগিল তখন সমস্তই বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু যখন ভাষায় বলিতে লাগিল তখন দেখিলাম ইতালিয়ান ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। এইজন্য অধিষ্ঠান বা Pose হইল চরিত্রের প্রধান কেন্দ্র। দ্বিতীয় অঙ্গ হইল দেশ ও কাল, অর্থাৎ কোন্ স্থানে বসিয়া কিরূপ সময়ে কথাবার্ত্তা কহিবে। ইহাতে লক্ষ্য না রাখিলে কাব্যের মাধুর্য্যহানি হয়। অলক্ষিতভাবে নায়ক ও নায়িকার বয়স নির্দ্ধারিত করিতে হইবে; কারণ বিশেষ বয়সে বিশেষ স্থানে বসিলে বিশেষরূপ মনোবৃত্তি হয় এবং তদনুযায়ী

বাক্যালাপও হইয়া থাকে। এই সকলকে পৃষ্ঠক্ষেত্র (Back-ground) বলা হয়। এই পৃষ্ঠক্ষেত্র হইতে অনেক বস্তু নির্ণয় করা যায়। তাহার পর নায়ক ও নায়িকা কিরূপ মনোভাব বিকাশ করিতেছে বা তাহাদের কি উদ্দেশ্য তাহাও দেখাইতে হয়। এইজন্য নাটক বহু অংশে বিভক্ত হইয়া রচিত হইয়া থাকে; স্থান ও সময়, পরিচ্ছদ, আনুষঙ্গিক ব্যক্তি, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নাটকে বিশেষ আবশ্যক অংশ।

কাব্য রচনা করিতে হইলে নায়ক বা নায়িকার মধ্যে একেকে মুখ্য ও অপরকে গৌণ করা যাইতে পারে। ইহা লেখকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু নায়ক বা নায়িকার ভাব পরিস্ফুট করিতে হইলে আনুষঙ্গিক কয়েকটি চরিত্র সন্নিবেশিত করিতে হয়; তাহারা নিজ নিজ ভাবে কথা কহিয়া অলক্ষিতে কেহ-বা নায়ক ও নায়িকার ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, কেহ-বা সমর্থন করিবে। এইরূপভাবে নানা মুখ দিয়া নানা কথা প্রকাশ করিতে হয়। যতপ্রকার ভাব প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করা যায়, ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিতর দিয়া নানারূপে ততপ্রকার ভাব দেখাইতে হয়। ইহা কখন সংযুক্ত হইবে, কখনও-বা বিপরীত হইবে, কিন্তু ঘটনার কাল সংক্ষিপ্ত হইবে। এই ঘটনার কাল নির্ণয় করা একটি বিশেষ লক্ষণ। মহাকাব্যে ঘটনার কাল দীর্ঘ করা যাইতে পারে, কিন্তু দৃশ্য-কাব্যে ঘটনার কাল সংক্ষিপ্ত হইবে, অর্থাৎ অল্প সময়ের ভিতর নানা ব্যক্তি নানা ভাব প্রকাশ করিয়া নানা ভাব-তরঙ্গ তুলিবে। মহাকাব্যে বর্ণিত চরিত্রসকল ধীরে ধীরে বাক্যালাপ করে, কিন্তু দৃশ্য-কাব্যে চরিত্রসকল পরস্পর অতি দ্রুতগতিতে আসিবে

এবং বাক্যালাপ করিবে, অর্থাৎ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবটা দেখাইতে হইবে। সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া নানা চরিত্র দ্রুতগতিতে আবির্ভাব ও প্রকাশ পাইবে এবং দ্রুতগতিতে ব্যস্ত-সমস্তভাবে কথা কহিবে—সামান্য ব্যাপারটা যেন একটা মহাপ্রলয়ের ব্যাপার হইয়া উঠিবে।'

দৃশ্য-কাব্য প্রণয়নকালে কতকগুলি গল্প রচনা করিতে হয়। এই সকল গল্পে নানা চরিত্র ও নানা স্থান দেখাইতে হয়— সমাজ, আচার-ব্যবহার, লোকের মনোভাব, বেশ-ভূষা, রন্ধন-প্রণালী, গৃহাদি, প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাব ও বস্তু প্রকাশ করা হইয়া থাকে; প্রত্যেক চরিত্র মূল চরিত্র হইতে পৃথক্; সেই গল্পের ভিতর কতকগুলি ক্ষুদ্র চরিত্র পরস্পরের সহিত নানাভাবে কথা কহিবে, যথা—বাজারে, স্নানঘাটে, বাড়ীতে, উদ্যানে এবং স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ কক্ষে বসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা ও আলোচনা করিবে। এই খণ্ড-আখ্যায়িকাগুলিতে বহু প্রকার ভাব দেখাইতে হয়, এবং উপহাস ও কৌতুক ভাব দিয়া সমাজের কিরূপ অবস্থা ও লোকের কিরূপ মনোভাব তাহা পরিস্ফুট করিতে হয়, অর্থাৎ লেখকের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, সমাজের যাহা কিছু দুর্নীতি আছে কিরূপে তাহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে কি করা যাইতে পারে, এই সমস্ত বিষয়ে চরিত্রের মুখ দিয়া কথোপকথন করাইবে। কিন্তু এই সকল চরিত্র বা স্থান বা কাল ভিন্ন ভিন্ন সময়ের হইবে; এইজন্য অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের আবশ্যক হয়, অর্থাৎ সমস্ত উপাখ্যানটা খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা দিক্ দিয়া, নানা ভাব দিয়া কথোপকথন করাইবে। সর্ব্ব-বিষয়ে বিশেষভাবে এমন একটা আলোচনা হইবে যাহাতে সেই কাল ও সমাজের

অন্তর্নিহিত ভাবসকল পরিস্ফুট হইতে পারে। মাঝে মাঝে হাস্য-কৌতুকও আবশ্যক ; কারণ প্রকৃত সমাজে সব সময়ে গম্ভীর ভাব থাকে না, সেইজন্য হাস্য-কৌতুক প্রভৃতির প্রয়োজন। পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক ইত্যাদি যে যে ভাবে কথাবার্ত্তা বলে সেই সকল ভাব বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক কিরূপভাবে বাক্যালাপ করে তাহা দেখাইতে হইবে, অর্থাৎ উচ্চ-শ্রেণীর লোক, মধ্যম-শ্রেণীর লোক ও নিম্ন-শ্রেণীর লোক নিজেদের ভাব অনুযায়ী কথাবার্ত্তা কহিবে, এবং স্ত্রীলোকদের ভিতরও নানা শ্রেণীর লোক নানা ভাবে কথা কহিবে—ঠিক যেন সমাজের একখানি চিত্র চোখের সম্মুখে ভাসিবে। এই কথোপকথন কালে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নিজেদের ভাষানুযায়ী কথা কহিবে ; কারণ সমাজে সকল শ্রেণীর লোক একই প্রকার ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে না। এইজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন শব্দ দ্বারা কথোপকথন করিবে। ইহা হইলে চিত্র পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট হয়।

দৃশ্যকাব্যের প্রধান অঙ্গ হইল, এই বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কথোপকথনের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। সমস্ত কথোপকথনের পরিশেষে একটি উদ্বোধক (Suggestiveness) অতি নিভৃত বা অলক্ষিত ভাবে সংযোজিত হইবে। এই উদ্বোধক এমনভাবে থাকিবে যে, তাহার পরে কি হইবে তাহার জন্য শ্রোতার মন উৎসুক হইবে এবং মূল চরিত্রের বিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিবে। খণ্ড-আখ্যায়িকার সহিত মূল উপাখ্যানের কি সম্বন্ধ আছে এবং কিরূপে তাহার পরিণতি ঘটিতেছে তাহা অতি নিপুণভাবে দেখাইতে হয় ; শ্রোতা বা পাঠক যেন বুঝিতে না পারে যে অলক্ষিতভাবে এক

উপাখ্যান হইতে আর এক উপাখ্যানে চলিয়া যাইতেছে। এই উদ্বোধক অতি নৈপুণ্যের সহিত সংযোগ করিতে হয়, তাহা না হইলে আখ্যায়িকা বিভিন্ন বা অসম্বন্ধ হইয়া যায়। এইস্থলেই কৃতী লেখকের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

এই আখ্যায়িকার ভিতর বহুবিধ অলঙ্কার প্রদর্শন আবশ্যক; যথা, প্ররোচনা (Persuasion), প্রোৎসাহন (Insinuation), আত্মগোপন (Dissimulation), বিভ্রান্ত-চিত্ততা (Distracted mind), ত্রাস (Panic, Consternation) বিভীষিকা (Fright), মোহ (Glamour), ক্রোধ (Ire), উত্তেজনা (Incitement), ইত্যাদি। বহুবিধ অলঙ্কার নানা চরিত্রের ভিতর দিয়া দেখাইতে হয়। নানা প্রকার অলঙ্কার না থাকিলে নানা ভাব বিশেষভাবে প্রকাশ করা যায় না। ইতিহাস নীরসভাবে উপাখ্যান বর্ণনা করিবে, কিন্তু কাব্যে নানা অলঙ্কার থাকায় নীরস উপাখ্যানও সরস হইয়া উঠে। সেইজন্য কাব্যে বহুবিধ অলঙ্কার সন্নিবিষ্ট করিতে হয়, কিন্তু প্রধান নিয়ম হইল যে, অলঙ্কার বা ভাব-বিকাশ একের পর অপরটি হইবে। যেমন একদিকে ক্রোধ দেখাইবে, তেমন অপর উপাখ্যানে হাস্যরস দেখাইতে হয়; তাহার পর করুণ-রস দেখাইতে হয়, তাহা না হইলে পাঠকের মনে বিরক্তি ভাব আসে। সব সময় এক ভাব থাকিবে না; বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন অলঙ্কার সন্নিবেশিত করিতে হইবে, এবং এই সকল অলঙ্কার দিয়া মূল চরিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে হইবে। মূল চরিত্র যে কেন্দ্র-স্থানীয় তাহা বহুভাবে দেখাইতে হইবে এবং তাহার সহিত যে সামঞ্জস্য আছে ইহাও পরিদর্শিত হইবে। মোট কথা, হাস্য-কৌতুক ও চাপল্যের ভিতর দিয়াও মূল চরিত্রের সহিত সম্পর্ক ও সংযোগ

দেখাইতে হইবে। ইহাই হইল অলঙ্কার ও আখ্যায়িকা সন্নিবেশের বিশেষ নিয়ম।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবে? মহাকাব্যে সকল চরিত্রই একই প্রকার ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে—সকলেই রাজসভার পরিমার্জ্জিত ও গম্ভীর ভাষায় কথোপকথন করিতেছে, এমন কি মুটে-মজুরও সভাসদ্‌দের ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে; কিন্তু দৃশ্য-কাব্যের নিয়ম অন্যবিধ। মহাকাব্যে দরবারী ভাষা (court language) প্রচলিত হয়, দৃশ্য-কাব্যে কিন্তু তাহা হয় না; প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক শ্রেণীর লোক—উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণী, পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক প্রভৃতি—নিজ নিজ সামাজিক ভাষা ও পর্য্যায় অনুযায়ী কথোপকথন করিবে। মহাকাব্যে কেবলমাত্র সভার ভাষা প্রকাশ পায়, কিন্তু, দৃশ্য-কাব্যে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, বিভিন্ন গ্রামের লোক, বিভিন্ন জেলার লোক কিরূপভাবে কথোপকথন করে এবং তাহাদের কি আচার-পদ্ধতি তাহা দেখাইতে হয়। এইজন্য এইস্থলে অভিধানের বানান বা বর্ণ-সংযোগ এবং নাটকের বানান বা বর্ণ-সংযোগ বিভিন্ন হইয়া থাকে। অভিধান-শব্দের বর্ণ-সংযোগ চিরন্তন প্রথা-অনুযায়ী ব্যাকরণ-বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে যতি-মাত্রা অন্য প্রকার; কিন্তু নাটকে নিম্ন-শ্রেণীর কথোপকথনে যেখানে শব্দপ্রয়োগ হয় তাহার উচ্চারণ বিভিন্ন প্রকার, যতি-মাত্রাও বিভিন্ন প্রকার। সেইজন্য বর্ণ-সংযোগ ও বানান অন্যবিধ না হইলে ঠিক সেই জেলার বা গ্রামের উচ্চারণ প্রকাশ পায় না। এইজন্য অভিধানের শব্দের বানান ও নাটকের শব্দের বানান বিভিন্ন প্রকার হয়। নাটকের

শব্দের বিভিন্ন বানান দোষের নহে, প্রত্যুত অত্যাবশ্যক ; তাহা না হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন জেলার লোকের উচ্চারণ ঠিক প্রকাশ পায় না। এইস্থলে কাব্য ও নাটকের বর্ণ-সংযোজনায় পার্থক্য আছে। নাটক হইল সমাজের প্রত্যক্ষ চিত্র বা ছায়া-চিত্র (Photo)। শব্দ-উচ্চারণ, আচার-পদ্ধতি, বেশ-ভূষা, এমন কি মস্তকের কেশ-বন্ধন, গ্রামের উপাখ্যান, গুরু মহাশয়ের পাঠশালা পর্য্যন্ত অনুরূপ শব্দ ও ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে হয়। মহাকাব্য ও নাটকে এই সকল বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। ভবিষ্যৎকালে সেই দেশের বিভিন্ন প্রকার ভাষা, আচার-পদ্ধতি, বেশ-ভূষা, এমন কি শব্দের উচ্চারণ পর্য্যন্ত যেন বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য পরবর্ত্তী কালে শব্দের উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ বিভিন্ন প্রকার যতি-মাত্রা দিয়া উচ্চারণ করিলে প্রকৃত ভাষা রক্ষা পায়—যেমন মুটে-মজুরের ভাষা, ঢুলির ভাষা বিভিন্ন, সেইজন্য বিভিন্ন প্রকারের যতি-মাত্রা আবশ্যক। এইস্থলে অভিধানের শব্দের বর্ণ-সংযোগ ও যতি-মাত্রা সব স্থলে ও সব চরিত্রের কথোপকথনে প্রযোজ্য নহে। ইহা হইল লেখকের নৈপুণ্যের—কৃতিত্বের—পরিচায়ক।

এইবার চরিত্র দেখাইবার প্রণালীর কথা। লেখক নিজের ভিতর প্রাণ বা সঞ্জীবনী শক্তি উদ্ভূত করিবে এবং সেই শক্তি চরিত্রে সংক্রান্ত করিয়া কথোপকথন করাইবে। তাহা হইলে চরিত্রের ভিতর একটা তেজঃপূর্ণ জীবন্তভাব আসিবে। কিন্তু লেখকের ভিতর যদি প্রাণ বা সঞ্জীবনী শক্তি উদ্ভূত না হয় তাহা হইলে বর্ণিত চরিত্রসকল নিস্তেজ ও হীন-প্রাণ হইয়া যায়। চিত্রকর বা শিল্পী নিজের ভিতর প্রাণ বা চেতনা শক্তি উদ্ভূত

করিয়া অঙ্কিত চরিত্রে উহার সমাবেশ করে। যে শিল্পী এইরূপ প্রাণ সঞ্চার করাইতে পারে তাহার অঙ্কিত চিত্র জীবন্ত হয়, তাহা না হইলে চিত্র মৃতকল্প হয়। কাব্য রচনা ও চিত্র অঙ্কন করা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া একই প্রকার। উভয়ের প্রথাই একই শ্রেণীর চারু-কলার অন্তর্গত। এইস্থলে বিশেষ একটি কথা বলা আবশ্যক। শিল্পী বা কবি আপনার ভিতর উদ্ভূত প্রাণকে দ্বিধা বিভক্ত করিবে—এক অংশ নিজের ভিতর দ্রষ্টা হইয়া থাকিবে, অপর অংশ কল্পিত চরিত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্রষ্টব্য হইবে। কল্পিত চরিত্র নানা ভাব-ভঙ্গী করিয়া কথোপকথন করিবে, এবং দ্রষ্টার মন সেই সকল নিরীক্ষণ করিয়া বর্ণ বা শব্দ দিয়া প্রকাশ করিবে। শিল্পী যেমন বর্ণ ও তুলিকা দিয়া চিত্র অঙ্কন করে, কবি তদ্রূপ শব্দ দিয়া বর্ণনা করে। চরিত্র বা চিত্র যাহা সাধারণ লোক দেখিতেছে, কল্পিত চরিত্র তাহা হইতে অনেক বিভিন্ন। লেখক নিজের ভিতর প্রাণ উদ্ভূত করিয়া চরিত্রকে যেরূপভাবে দেখিয়াছে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সাধারণ চক্ষের বস্তু বা চরিত্র নহে। - যেমন একটি পথভ্রান্ত গাভী, সাধারণ লোক যাহা সচরাচর দেখিতেছে, তাহার ভিতর কোন আকর্ষণী শক্তি থাকে না, কিন্তু শিল্পীর অঙ্কিত পথভ্রান্ত গাভী অতি মনোহর! শিল্পী যেরূপভাবে সেই গাভীটি লক্ষ্য করিয়াছে, সেই সময় তাহা তাহার মনের অলক্ষিতভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া গাভীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইজন্য সাধারণ গাভী ও শিল্পীর অঙ্কিত গাভীর মধ্যে এত পার্থক্য হয়।

কবির চরিত্র-বর্ণনাকালেও এইরূপ হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষ সাধারণ ঘটনা যাহা প্রত্যহ দেখিয়া থাকে, কবির বর্ণিত

চরিত্র, ঘটনা বা বর্ণনা তাহা নহে। সাধারণ ঘটনা ও বর্ণনার উপর কবি নিজে প্রাণ ও ভাবপুঞ্জ সন্নিবেশিত করিয়া উহা নূতন প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছে, সেইজন্য ইহাতে মাধুর্য্য আসে। সাধারণ ব্যক্তি বা ঘটনাতে কোন আকর্ষণী শক্তি বা মাধুর্য্য নাই; কিন্তু অলক্ষিতভাবে ভাবপুঞ্জ থাকায়, এবং কবির সেই সময় মনের কিরূপ ভাব হইয়াছিল তাহা প্রতিফলিত করায়, নূতন সৃষ্টি হইল। কবি স্বয়ংই এক প্রকার জগতের স্রষ্টা; ইহা সাধারণ জগৎ নয়, কিন্তু ভাবরাজ্যের ভিন্ন জগৎ। এইটি হইল শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। চরিত্রবর্ণনা-কালে ঠিক সম্মুখ দিক হইতে চিত্র লইবে না, পশ্চাদ্দিক হইতেও চিত্র লওয়া উচিত নহে, কিন্তু এমন একটি কোণ হইতে দর্শন করিতে হইবে যাহাতে বিপরীত ভাব সকলও সংযুক্ত এবং সংমিশ্রিত হইয়া যায়, এবং এই সংমিশ্রণ হইতে নূতন আর এক ভাব বা চিত্র প্রণয়ন করিতে হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Profile View বা চ্যাপটা ভাব বলে। আর একটি হইল Contour View অর্থাৎ পশ্চাতের ভাব। ইহাতেও এক অংশ দেখা হইল, কিন্তু উভয় অংশের ভিতর কি সামঞ্জস্য আছে তাহাই দেখানই কবির উদ্দেশ্য। এই দ্রষ্টব্য স্থান হইতে নিরীক্ষণ করিয়া নিজের প্রাণের উদ্ভূত জীবন্ত শক্তি সন্নিবেশিত করিয়া ভাবপুঞ্জ দিয়া চরিত্রকে পরিপুষ্ট করিতে হয়। তাহা হইলে চরিত্রের ভিতর নূতন প্রাণ, নূতন সৃষ্টি, নূতনভাবে জগৎকে দর্শন ও নূতনভাবে জগতের সম্বন্ধ দর্শান যাইতে পারে। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ অঙ্গের কবি ও দার্শনিক একই শ্রেণীর হয়। একদিকে যেমন চিত্রশিল্পী ও কবি অঙ্কনকালে বা প্রকাশকালে এক হয়, তদ্রূপ চিন্তাস্রোত ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে

শ্রেষ্ঠ অঙ্গের কবি ও দার্শনিক একই হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে সমাজ কিরূপ হওয়া উচিত ও সমাজের কোন দিকে গতি হওয়া উচিত, সেই সকল চরিত্রের মুখ দিয়া প্রকাশ করান হয়। এইজন্য শ্রেষ্ঠ অঙ্গের কবি উপদেষ্টার স্থান অধিকার করেন। ধর্ম্ম-উপদেষ্টা কেবলমাত্র উপদেশ দিয়া থাকেন, "জগৎ ত্যাগ করিয়া উচ্চস্তরে মন লইয়া চল।" এই সকল উপদেশ সত্য হইলেও সাধারণ লোকের প্রীতিকর নহে; কারণ এরূপ কঠোর পন্থা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু সুকবি দেখাইয়া থাকেন যে, জগতের ভিতরে থাকিয়া, সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম করিয়া কিরূপে উচ্চভাব সকল দেখান যাইতে পারে। ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিলেন, "সব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম চিন্তা কর।" সুকবি বলিলেন, "সংসারের ভিতর থাক, উহার ভিতরই ব্রহ্ম আছে; সংসারের প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর ব্রহ্মকে দেখিতে চেষ্টা কর।" ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট যাইতে হইলে একটু ত্রস্ত-ভীত হইয়া যাইতে হয়; কবি-উপদেষ্টার কাছে সাধারণভাবে যাইয়া হাস্যকৌতুক ও মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া নানাপ্রকার উচ্চ উপদেশ গ্রহণ করা যায়। জগৎ বা সংসারকে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করাই সৎ-কবির উদ্দেশ্য। এইজন্য চিত্রশিল্পী, কবি, দার্শনিক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা একই শ্রেণীর ভিতর আসে এবং সকলের ভিতরে একটা সামঞ্জস্য ও ঘনিষ্ঠভাব পরিলক্ষিত হয়।

মহাকাব্যে চরিত্র-বর্ণনা ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। ইহার কারণ হইল সময়ের কোন নির্দ্ধারিত ফল নির্দ্দিষ্ট হয় না, অনেকটা সময়ও পাওয়া যায়। বর্ণনা ও চরিত্র সকলের

কথোপকথন ধীরে ধীরে ও দীর্ঘকালব্যাপী হইয়া থাকে। এই প্রথানুযায়ী মহাকাব্যের উৎকর্ষ পরিদর্শিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নানা স্থানে বর্ণিত হওয়ায় ও চরিত্রের মনোভাব ধীরে ধীরে কথোপকথনে প্রকাশ পাওয়ায়, পাঠক সুস্থির হইয়া সকল বিষয় অনুধাবন করিতে পারে। কিন্তু দৃশ্য-কাব্যের প্রথা অন্যবিধ। ইহাতে একটা বিশিষ্ট ঘটনা লইয়া নানা ভাব ও নানা বর্ণনা দেখাইতে হইবে। সময় সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ, এইজন্য প্রত্যেক চরিত্র দ্রুত ও চঞ্চলভাবে আসিয়া সংক্ষেপে কথা বলিয়া যাইতেছে। এই চঞ্চলভাবে প্রবেশ ও গমন এবং সংক্ষেপে দ্রুতভাবে কথোপকথন হইল দৃশ্য-কাব্যের বিশেষ অঙ্গ। মহাকাব্যে স্থানের ও বেশভূষার যেরূপ বর্ণনা আছে, দৃশ্য কাব্যে তাহা পরিত্যক্ত হয়; কেবলমাত্র সংক্ষেপে অভিনয়োপযোগী কিঞ্চিৎ বলা হয়, কথোপকথন অংশটি প্রদত্ত হইয়া থাকে। মহাকাব্যে ও দৃশ্য-কাব্যে এই সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে।

মূল চরিত্রের ভিতর একটি আকর্ষণী শক্তি থাকিবে যাহাকে ইংরাজীতে Interest বা মনোগ্রাহিতা বলা হয়। কেন্দ্রীয় চরিত্রকে এইরূপভাবে দেখাইতে হইবে, তাহার ক্রিয়া-কলাপ ও কথোপকথন এইরূপভাবে বর্ণিত হইবে যে, পাঠকের মনে সততই একটা আগ্রহ জাগিয়া উঠিবে। একটা সামান্য দৈনন্দিন ব্যাপারকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিতে হয় যেন পাঠকের মনে হইবে যে, এই ব্যক্তি জগতের কেন্দ্রস্থলভুক্ত এবং ইহার ব্যাপার জানিবার জন্য সমস্ত জগতের লোক উৎসুক হইয়া রহিয়াছে—ব্যাপারটি কিন্তু যৎসামান্য ও দৈনন্দিন ঘটনা। ইহাই হইল লেখকের কৃতিত্ব, ইহাকেই বলে Interest অর্থাৎ কেন্দ্র-চরিত্রের প্রতি একটা

আকর্ষণ ও আগ্রহ উদ্দীপন করা। কেন্দ্র-চরিত্র যাহা বলিতেছে ও করিতেছে তাহাই যেন ঠিক অভ্রান্ত এবং তাহার প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপ ও কথোপকথন মনঃসংযোগ করিয়া শুনিবার বিষয়। ইহাই হইল Interest বা আগ্রহ উদ্দীপন করা।

অপর একটি বিষয় হইল অবাস্তবকে বাস্তব দেখান। ঘটনা অতি সামান্য ও দৈনন্দিন এবং প্রত্যেক লোকই এইরূপ ঘটনা বহু দেখিয়াছে, কিন্তু সেইটিকে এইরূপভাবে দেখাইতে হইবে এবং ভাব-সংযোগ করিয়া এমন নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যে, পাঠক বিভোর ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে। ভাবসকল এইরূপভাবে সন্নিবেশিত ও বিশ্লেষিত করিতে হইবে, পারম্পর্য্য অনুযায়ী ভাবের আধিক্য, পরিণতি ও বিবর্ত্তন দেখাইতে হইবে যে, পাঠক নূতন জগতে নূতন ভাবরাশি ও ঘটনা দেখিবে। ইহা হইল কল্পনাশক্তির পরিচায়ক অর্থাৎ অলীককে সত্য বলিয়া দেখান, যেন সর্ব্বত্রই ইহা সম্ভবপর অর্থাৎ হইতে পারে। ইহাই হইল কল্পনা-শক্তির বিশেষ পরিচায়ক। ইহাকে বলে Argument on Possibilities অর্থাৎ সম্ভবের উপর বিচার করা। এইজন্য অসত্য বা অবাস্তবও সত্য বা বাস্তব বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সকল হইল লেখকের নিজ কল্পনাপ্রসূত জগতের বিষয়। ইহা বাস্তব-জগতের দৈনন্দিন ঘটনা নয়। লেখকের কল্পিত-জগৎ বাস্তব-জগৎ হইতে অন্যবিধ হইয়া থাকে। এইজন্য সুকবিকে কল্পনা-জগতের স্রষ্টা বলিয়া থাকে—এইজন্য রাজতরঙ্গিণীতে কহ্লণ ব্রহ্মার সহিত কবিকে তুলনা করিয়াছেন:—

কোঽন্যঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ।
কবিপ্রজাপতীস্ত্যক্ত্বা রম্যনির্ম্মাণশালিনঃ॥

অর্থাৎ রম্যবস্তু-বিধানশিল্পী কবি-প্রজাপতি (কবিরূপ বিধাতা) ভিন্ন আর কে অতীত কালকে প্রত্যক্ষ করাইতে পারে ?

মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মনের গতি, পরিণতি, পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিচার করা হইয়া থাকে। ইহা নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস। কাব্যে ঠিক সেই ভাবসকল চরিত্র ও কথোপকথন দিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু নীরসকে সরস করিবার জন্য ভাব বা রসের একবিন্দু অর্থাৎ tinge of sentiment সংযোগ করিতে হয় ; এইজন্য মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান ও কাব্যে পার্থক্য হইয়া যায়। একটু Sentiment বা রস থাকায় কাব্য সকলের পাঠোপযোগী ও চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে, কিন্তু মনস্তত্ত্বের বিষয়-বস্তু কেবলমাত্র কতিপয় পণ্ডিতের জন্যই রচিত হয়।

ন্যায়-শাস্ত্র বা Logic-এ স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ (Direct) তর্ক-যুক্তি দিয়া ভাব বা বস্তু নির্ণয় করিতে হয়। কাব্যে স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ তর্ক বাঞ্ছনীয় নয়। কাব্যে সম্ভবপর পন্থার কথোপকথন বর্ণিত হইবে, অর্থাৎ এমনভাবে বর্ণ-বিন্যাস হইবে যে, তাহার পরিণতি বা মীমাংসা অন্যবিধ হইবে। এই সম্ভবপর ভাব হইল অলঙ্কারের অন্তর্গত। সম্ভবপর ভাব (Possibilities) বহুবিধ হইতে পারে, এইজন্য ইহার অলঙ্কারও নানাবিধ হইয়া থাকে এবং এই সকল অলঙ্কারের মীমাংসা ও পরিণতি বহুপ্রকার করা যাইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় অনুশীলন করিলে মনস্তত্ত্ব, ন্যায় ও কাব্যের পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। যদিও এই তিন শাস্ত্র একই মনের গতির বিষয় বর্ণনা করে, তথাপি তিন শাস্ত্রের রচনা-প্রথা বিভিন্ন প্রকার। এইজন্য প্রথম দর্শনে এই তিন শাস্ত্রের ভিতর বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে তিনই এক বিষয় বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আলেখ্য বা পুঞ্জচিত্র দেখাইতে হইলে প্রথমে একটি কেন্দ্রীয় বিগ্রহ অঙ্কন করিতে হয়। তাহার পর চিত্রের ডানদিক্ হইতে অন্য চিত্র বা বিগ্রহ অঙ্কন করিয়া ধীরে ধীরে নিম্নস্তরে বা বিপরীতভাবে চিত্র প্রদর্শন করিতে হয়। এই বিপরীত চিত্র বা নিম্নস্তরের চিত্র হইতে পুনরায় ধীরে ধীরে বামদিক্ হইতে মূর্ত্তি সংযোগ করিয়া অবশেষে প্রধান বা কেন্দ্রীয় মূর্ত্তির সহিত সামঞ্জস্য বা নৈকট্য দেখাইতে হয়। এই হইল পুঞ্জচিত্রের সাধারণ নিয়ম। এই সকল চিত্র প্রদর্শনকালে প্রথম বর্ণ কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হয়। কেন্দ্র বা প্রধান বিগ্রহের কিঞ্চিৎ-ন্যূন বর্ণ আনুষঙ্গিক বা পার্শ্ব-প্রতীকে দিতে হয়; তাহার পর ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পার্শ্বমূর্ত্তি সকল দেখাইতে হয়। অবশেষে নিম্নস্তর বা বিপরীত মূর্ত্তিতে কেন্দ্রীয় বা প্রধান চিত্রের বিপরীত বর্ণ সংযোজিত হয় এবং তাহার পর কিঞ্চিৎ স্ফীত করিয়া বর্ণসংযোগপূর্ব্বক বামদিকের পার্শ্বমূর্ত্তি সকলকে দর্শাইয়া অবশেষে বামদিকের ঊর্দ্ধস্তর পার্শ্ব-মূর্ত্তিতে আনিতে হয়। ইহার বর্ণ প্রধান বিগ্রহ বা কেন্দ্রীয় মূর্ত্তির বর্ণের অনুরূপ বা সামঞ্জস্য ভাবে থাকিবে। এইরূপ ভাবে ধীরে ধীরে বর্ণের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিলে চক্ষুর দৃষ্টিতে কোন প্রকার কষ্ট হয় না। এই হইল পুঞ্জচিত্রের বর্ণ-সংযোগের প্রধান নিয়ম, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় চিত্রের বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে নানাবর্ণ সংযোগ ও পরিবর্ত্তন করিয়া, অবশেষে বিপরীত বর্ণে আসিতে হয় এবং বিপরীত বর্ণ হইতে হইতে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধগতি করিয়া কেন্দ্রীয় বর্ণের সান্নিধ্যে আসিতে হয়।

অধিষ্ঠান বা Pose বিষয়েও ঐ একই নিয়ম অনুসৃত হয়। কেন্দ্রীয় চিত্রে যেরূপ অধিষ্ঠান থাকিবে পার্শ্বমূর্ত্তিতে তাহার

কিঞ্চিৎ ন্যূন অধিষ্ঠান দেওয়া হয়। এইরূপ পার্শ্বমূর্ত্তিতে নানা-প্রকার অধিষ্ঠান দিয়া অবশেষে বিপরীত মূর্ত্তির অধিষ্ঠান দেখাইতে হয়। কেন্দ্রীয় মূর্ত্তির ঠিক বিপরীত অধিষ্ঠান এই মূর্ত্তিতে থাকিবে এবং তাহার পর অপর পার্শ্বমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠানের তারতম্য হইয়া অবশেষে পার্শ্বমূর্ত্তি কেন্দ্রীয় মূর্ত্তির সান্নিধ্য-অধিষ্ঠানে যাইবে। পুঞ্জ-চিত্রে এইরূপ বর্ণ ও অধিষ্ঠান প্রদর্শন আবশ্যক। সহসা বর্ণ ও অধিষ্ঠান পরিবর্ত্তন করিলে চক্ষুতে কষ্ট হয় এবং ভাবের বিপর্য্যাস হইয়া যায়। ভাব বিষয়েও এইরূপ নিয়ম। ভাবসকল ধীরে ধীরে পরিস্ফুট ও পরিবর্ত্তিত করিয়া বিপরীত ভাবে আনিতে হয় এবং তথা হইতে ভাবের নানা পরিবর্ত্তন দেখাইয়া কেন্দ্রীয় চরিত্রের বা চিত্রের সান্নিধ্য ভাব দেখাইতে হয়। এই স্থলে আর একটি কথা হইল এই যে, সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। কোন পার্শ্বমূর্ত্তিতে ভাব কম-বেশী হইবে না এবং কেন্দ্রীয় মূর্ত্তির অনুরূপ ও অধীন ভাব থাকিবে। এই ভাবের পরিমাণ বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহাকে Cadence বা Symmetry বলে। ঠিক্ পরিমাণ হিসাবে ভাবসকল থাকিবে। ইহার বিপর্য্যাস হইলে অসামঞ্জস্য হইয়া যায়। সামঞ্জস্য চিত্রের একটি প্রধান অঙ্গ।

পুঞ্জচিত্রে যেরূপ বর্ণ, অধিষ্ঠান ও ভাবের সামঞ্জস্য রাখিয়া চিত্র অঙ্কিত হয়, কাব্যেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। নায়ক বা নায়িকাকে প্রধান করিয়া পার্শ্ব-চরিত্র সকল নিজ নিজ ভাবে বাক্যালাপ করিবে, কিন্তু নায়ক বা নায়িকার অধীন থাকিবে। প্রধান চরিত্র মুখ্য হইবে, অপর চরিত্র সকল গৌণ হইবে; অবান্তর চরিত্র মুখ্য-চরিত্রের সমান হইলে দোষের

হইবে, কেন-না তাহা হইলে তুইটি কেন্দ্র হইয়া যায়। মনঃ-সংযোগ একটি কেন্দ্রে হইবে এবং সেই কেন্দ্র হইতে ভাব সকল পরিস্ফুট হইয়া পার্শ্ব-চরিত্র দিয়া নানারূপে বিকাশ পাইবে এবং অবশেষে বিপরীত চরিত্রে বিপরীত ভাব দেখাইতে হইবে। এই বিপরীত চরিত্রকে কাব্যে Villain ও Sub-Villain অর্থাৎ পণ্ডকারী ও সহায়ক-পণ্ডকারী বলে। এই তুই চরিত্রের উদ্দেশ্য হইল কেন্দ্রীয় চরিত্রের সকল কার্য্য, ভাব ও উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার চেষ্টা করা; তাহা হইলে পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় চরিত্রের উদ্দেশ্য, মনোভাব এবং শক্তির আধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেরূপ ভাবে বাধাবিঘ্ন আনিয়া ইহারা কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভাব প্রতিরোধ করিবে এবং তাহার সকল কার্য্য পণ্ড করিবার প্রয়াস করিবে, কেন্দ্রীয় চরিত্র তত অধিক শক্তি বিকাশ করিয়া তাহা অতিক্রম করিবে এবং অবশেষে পার্শ্ব-চরিত্র সকল সহায়ক হইয়া প্রধান চরিত্রের উদ্দেশ্য সফল করিবার আনুকূল্য করিবে। পুঞ্জচিত্রে যেরূপ অঙ্কন প্রণালী, কাব্যেও তদ্রূপ চরিত্র-সংযোগের নিয়ম; উভয়বিধ বিকাশ-মূলক চিত্র একই প্রকার হইয়া থাকে। কাব্যে প্রধান চরিত্রে অধিষ্ঠান, সময়, ঋতু, আবরণ বা পরিচ্ছদ, বয়স ইত্যাদি প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। পৃষ্ঠক্ষেত্রে (Background) এইরূপ নানা আনুষঙ্গিক ভাব প্রদর্শন করিয়া কেন্দ্র-চিত্রের অস্ফুট মনোভাব-সকল প্রকাশ করিতে হয়। ভাষা ও শব্দ দিয়া সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, উচিতও নয়। আনুষঙ্গিক বস্তু দিয়া ও পৃষ্ঠক্ষেত্র দিয়া অতি-গূঢ় মনোভাবসকল দর্শাইতে হয়। প্রধান চরিত্রের অধিষ্ঠান এইরূপে নির্ম্মিত করিয়া পার্শ্ব-চরিত্র প্রদর্শন করিতে হয়। পার্শ্ব-চরিত্রের ভাব প্রধান চরিত্রের

ভাবের অধিক হইবে না; কেবলমাত্র অনুগত ও সহায়ক হইয়া ধীরে ধীরে প্রধান চরিত্রের ভাব বিকাশ করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপে কয়েকটি পার্শ্ব-চরিত্র দিয়া অলক্ষিতভাবে প্রধান চরিত্রের ভাব পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া পণ্ডকারী চরিত্রে আসিতে হয়। এই পণ্ডকারী চরিত্র প্রধান চরিত্রের ভাব বিপরীতভাবে দেখাইবে, অর্থাৎ প্রধান চরিত্রের উদ্দেশ্য-সকল বিপরীতভাবে প্রদর্শন করিবে। এই পণ্ডকারী একক না হইয়া আর একজনকে সহায়ক লইবে এবং নিভৃতে গূঢ়-পরামর্শ করিয়া প্রধান চরিত্রের উদ্দেশ্য বিপরীতভাবে দেখাইবে। তাহার পর অপর কয়েকটি পার্শ্ব-চরিত্র আনিয়া পণ্ডকারীর ভাব ও উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে বিফল ও নিরাকৃত করিবে। এই সকল পার্শ্ব-চরিত্র সহায়ক হইয়া প্রধান চরিত্রের উদ্দেশ্যসকল সফল করিবে। প্রধান চরিত্রের ভাবসকল নানা বাধা-বিঘ্ন ও কষ্টের ভিতর দিয়া যাইয়া অবশেষে প্রস্ফুটিত ও সফল হইবে। সকল কাব্যেই অল্প-বিস্তর এই পণ্ডকারীকে প্রদর্শন করিতে হয়। ইহা না হইলে প্রধান চরিত্রের ভাব দ্বিগুণিত ভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না।

এতদ্ব্যতীত পার্শ্ব-চরিত্রের ভিতর অধিষ্ঠান আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয়। পার্শ্ব-চরিত্রের নানা অধিষ্ঠান ও মনোভাব থাকিবে। প্রত্যেক পার্শ্ব-চরিত্র নিজে নিজে স্বাধীন, কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্রের সহিত উহার সামঞ্জস্য ও অধীনতা থাকিবে, কেন্দ্র-চরিত্রের অধিক বা সমান কখনও হইবে না। এই সামঞ্জস্য বা Cadence একটি প্রধান অঙ্গ; কারণ সামঞ্জস্য না থাকিলে বিরস হইয়া যায়। চরিত্র অধিক কথাও কহিবে না, একেবারে অল্প কথাও কহিবে না; যে স্থলে যেরূপ আবশ্যক

সেইরূপ সামঞ্জস্য রাখিয়া কথা কহিবে। এই স্থলেই হইল শিল্পীর কৃতিত্ব; ইহার অন্যথা হইলে দোষ হয়। অধিষ্ঠান, মনোভাব, সামঞ্জস্য, সময়, ঋতু ও স্থান এই সকল হইল চরিত্রের বিশেষ অঙ্গ। এই সমস্ত বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য রাখিলে কাব্য মধুর হইয়া থাকে। আলেখ্য বা পুঞ্জচিত্রের যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, কাব্যেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। উভয়ের বিকাশই এক মনস্তত্ত্বের নিয়মে চলে। সামঞ্জস্য ও অধিষ্ঠান এই দুইটি হইল প্রধান অঙ্গ; তাহার পর পৃষ্ঠক্ষেত্র। এই পৃষ্ঠক্ষেত্রে অনেক বস্তু দর্শান যাইতে পারে। এইরূপ নানা ভাবের পরিবর্ত্তন, পরিণতি, বৃদ্ধি ও হ্রাস এবং নানা ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া চরিত্র প্রদর্শন করিতে হয় এবং অবশেষে যে সকল প্রধান হইয়াছে তাহাই বিকাশ পায়।

কাব্যলেখক তিন শ্রেণীর হয়। এক শ্রেণীর কবির রচনার ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় যে, শব্দ অল্প, ভাব অধিক; যেমন, উপনিষদের ঋষিগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার ভিতর লক্ষ্য হয় যে, শব্দ ও ভাব সমান; যেমন, বেদব্যাস প্রভৃতি কবিগণ। তৃতীয় শ্রেণীর রচনার ভিতর দেখা যায় যে, শব্দ অধিক, ভাব অল্প; যেমন, বাণভট্টের কাদম্বরী প্রভৃতি। প্রথম শ্রেণীর কবির ভিতর শব্দ অল্প ও ভাব অধিক থাকায় তাঁহারা দার্শনিক পদবাচ্য। এইরূপ স্থলে বহু কবি ও দার্শনিক এক হইয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা চিন্তা করিয়া অল্প শব্দ দিয়া ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যে ভাব ও শব্দ অনুরূপ। ইহাদের ভাব যেরূপ গম্ভীর, শব্দও তদনুরূপ। এই সকল কবি হইলেন জনসমাজে আদরণীয় ও শ্রদ্ধেয়। প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা

অল্পসংখ্যক চিন্তাশীল পাঠকের জন্য; কিন্তু ভাব ও শব্দ সমঞ্জস ও অনুরূপ থাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি আদরণীয় হইয়া থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীর কবির ভাব অল্প, শব্দ অধিক। ইঁহারা সাধারণ পাঠকের প্রীতি-ভাজন হইতে পারেন, কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক ইঁহাদের রচনার তদ্রূপ সমাদর করেন না। এই সকল কাব্য অল্পদিন পরেই তিমিরে বিলীন হইয়া যায়। জগতে বহুবিধ কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র চিরস্থায়ী হইয়াছে, অন্যান্য কাব্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্যই তিন শ্রেণীর কাব্যের বিষয় যৎসামান্য বিশ্লেষণ করা হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গ্রীকদিগের ভিতর Tragedy বা "পাঁঠাবলির পালা গান" প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন-কালে গ্রীসদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে Tragedyর প্রবর্ত্তন হয় নাই এবং হইবার আবশ্যকতাও ছিল না। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের এইরূপ মত যে, "গ্রীক কাব্য ও নাটক অনুকরণ করিয়া ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্য রচিত হইয়াছিল।" কিন্তু উভয়বিধ কাব্যের মূল উদ্দেশ্য প্রণিধান করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে. ভারতীয় ও গ্রীক কাব্যের ভিতর কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই। উভয়বিধ কাব্যের উদ্দেশ্য বিভিন্ন, রচনা-প্রণালী বিভিন্ন। ভারতীয় কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমাজ-জীবনে শান্তি ও উচ্চভাব প্রদর্শন করা—এক কথায়, দেবভাব উদ্বুদ্ধ করা। কান্তার সহিত নিভৃতে বসিয়া সদালাপ করিয়া যেমন সরস মধুর উপদেশ লাভ হয়, কাব্য-পাঠেও সেইরূপ সরস মধুর উপদেশ লাভ করা যায়, ইহাই আলঙ্কারিকগণের মত (কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে)।

সেইজন্য কাব্যে হাস্যরস ও চাপল্যভাব থাকিলেও তাহার ভিতর মাধুর্য্য ও উচ্চভাব দর্শাইতে হইবে।

বৌদ্ধযুগে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আধিক্য ও গৃহাদি ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত কঠোর ব্রহ্মচিন্তা যেন সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংসার বা জগৎ হেয় বস্তু, এবং কঠোর যতি-ব্রত জাতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য! বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়মাবলীর বিপরীত ভাব দেখাইবার জন্যই দৃশ্যকাব্য রচিত হইয়াছিল—গ্রীকদিগের ন্যায় অত্যাচার-নিবারণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এইরূপ একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধদেবের জীবনের সমস্ত লীলা লইয়া সাধারণ লোককে তাঁহার আদর্শ বুঝাইবার জন্য লীলাভিনয় হইত। এই লীলা-গানকে ইংরাজি ভাষায় Passion Play বলে। ইউরোপের মধ্যযুগে যীশুখৃষ্টের জীবনের উপাখ্যান লইয়া সন্ন্যাসিগণ এইরূপ পালা-গান করিত। অদ্যাপি পারস্যদেশে হোসেনের জীবনের ঘটনা লইয়া এইরূপ পালা-গান অভিনীত হইয়া থাকে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যদেশে অবস্থান-কালে আমি প্রায়ই এইরূপ পালা-গান শুনিতাম; দেখিয়াছি যে, এক একটি পালা-গান অতি হৃদয়স্পর্শী হইত। লীলা-গান বা পালা-গান ধর্ম্মবিষয়ে হইত। পক্ষান্তরে ইহাকে যাত্রা বলে। যাত্রা অর্থে গমন বুঝায়। এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধদেব বা অন্য কোন দেবদেবীর একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন—এই সকল আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া অভিনয় রচিত হইত; এইজন্য ইহার নাম "যাত্রা" হইয়াছে—যেমন রথযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি।

সব সময়ে দেবদেবীর উপাখ্যান প্রীতিকর না হওয়ায়, রাজা বা তৎসদৃশ ব্যক্তির বিষয়ও বর্ণিত হইত। পূর্ব্বকালে মদনোৎসব সমাজের এক বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এই মদনোৎসব বিষয়ে পূর্ব্বে পালা-গান বা অভিনয় হইত। এইরূপে নানা প্রবাহ ও পরিণতির ভিতর দিয়া দৃশ্যকাব্য বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় দৃশ্যকাব্য যে গ্রীকদিগের কাব্য অনুকরণ করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা কোন প্রকারে অনুমিত হইতে পারে না। উভয় কাব্যের উদ্দেশ্য, অলঙ্কার ও রচনাপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত এই যে, ভারতীয়েরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে স্থাপত্যবিদ্যা (Architecture) শিখিয়াছে। ইহাও একটি গ্রীক-মোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কারণ উভয় জাতির স্থাপত্যবিদ্যার প্রণালী অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীক ও ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। আমার "Principle of Sacred Architecture" গ্রন্থে এ বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কোন কোন আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন যে, গ্রীকদিগের নিকট হইতে ভারতীয়েরা মূর্ত্তি (Statue) নির্ম্মাণ শিখিয়াছে। ইহাও একটি নিতান্ত ভ্রমাত্মক ধারণা। এই সব বিষয় আমার "Dissertation on Painting" গ্রন্থে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। এখানে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, উভয় প্রাচীন জাতিই নিজ নিজ মনোবৃত্তি, সমাজ ও প্রাকৃতিক আবরণ অনুযায়ী নিজ নিজ ভাবে নানাবিধ শিল্প-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিল—কেহ যে কাহারও নিকট হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ বলা যায় না।

পূর্ব্বকালে দেবতা, রাজা বা তৎসদৃশ ব্যক্তির খণ্ড-উপাখ্যান লইয়া দৃশ্যকাব্য রচিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে দৃশ্যকাব্যের কেন্দ্র ভিন্নরূপ হইয়াছে। বর্ত্তমানে রাজা বা দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া সমাজ ও গণকে কাব্যের কেন্দ্র করা হইয়াছে। এইজন্য কাব্যের ধারা ও শিল্প-নৈপুণ্য প্রাচীন নিয়ম হইতে ভিন্ন প্রকার হইতে চলিয়াছে। সমাজের আভ্যন্তরিক ভাব, সাধারণ লোক কি ভাবে জীবন যাপন করে এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ কিরূপভাবে হইয়া থাকে, তাহাই পরিদর্শন করান এখন কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যের ভিতর বহু পার্থক্য ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। রাজা, মহারাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করিবেন তাহা বর্ত্তমান কাব্যের লক্ষ্য নহে। সমাজের প্রাণ যে নিরাশ্রয় কঠোর-পরিশ্রমী দরিদ্রগণ— তাহাদের জীবনযাত্রা কিরূপভাবে চলিতেছে তাহাই দর্শান হইল এখনকার কাব্যের প্রধান লক্ষ্য। এইজন্য উভয় কালের কাব্যের কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কাব্যে Pre-nuptial এবং Post-nuptial ভাব— অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বানুরাগ ও পরানুরাগ—দেখাইতে হইবে, এবং কতদূর তাহার সামঞ্জস্য রাখিতে পারা যায় তাহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রাচীন কাব্যে পূর্ব্বানুরাগ তদ্রূপ দর্শিত হইত না, ইহাকে অনেকে দূষণীয় বিবেচনা করিতেন; কিন্তু মধ্যযুগে বৈষ্ণবগ্রন্থে পূর্ব্বানুরাগ ও অভিসার এই দুই ভাবই লক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে সমাজ সবিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং বহুবিধ নূতন ভাব উদ্ভূত ও প্রচলিত হইয়াছে। কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, চিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা। এক্ষণে প্রশ্ন

হইতেছে, "পূর্ব্বরাগ বর্ত্তমানকালে কাব্যে চলিতে পারে কি না ?" সমাজের যেরূপ গতি ও পরিণতি দেখা যাইতেছে তাহাতে পূর্ব্বরাগ প্রদর্শন যে একেবারে অসঙ্গত তাহা বলা যায় না ; তবে পরিমাণ ও স্থান বিশেষে পূর্ব্বরাগের সন্নিবেশ করা যাইতে পারে, কারণ সমাজে এইরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হইতেছে। বিবাহের পর যে অনুরাগ—যাহাকে বলে দাম্পত্য-প্রণয় তাহা ঐকান্তিক, স্থায়ী ও দৃঢ় ভাবে প্রদর্শন করানই প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রোতার ও সমাজের মনোবৃত্তি-অনুযায়ী কাব্যের চরিত্র ও অলঙ্কার দেখাইতে হয়। অলঙ্কারের উদ্দেশ্য হইল, অল্প সময়ের ভিতর শ্রোতার মনকে অভিভূত করিয়া আত্মপক্ষে আনয়ন করা। ন্যায়ের উদ্দেশ্য হইল, তর্কযুক্তি-দ্বারা বিচার-বুদ্ধিকে প্রজ্বালিত করা। নানারূপ তর্কযুক্তি দিয়া বিপক্ষকে পরাস্ত করা এবং তাহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির কিরূপ প্রাচুর্য্য আছে তাহা প্রদর্শিত করাই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল, শ্রোতার ভিতর গভীর চিন্তা উদ্ভূত করা। ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হইল, ভাষা কিরূপ পরিমার্জ্জিত হইবে, এবং প্রত্যেক শব্দের সহিত অপর শব্দের কিরূপ সামঞ্জস্য থাকিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা। এই সমস্ত হইল ভিন্ন ভিন্ন মনোবিজ্ঞানের ও শব্দশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ; কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল, শ্রোতার মনকে অল্প সময়ের মধ্যে অভিভূত করা।

পূর্ব্বে কাব্যের লক্ষণের বিষয়ে সামান্যভাবে বলা হইয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কাব্য কিরূপ হইবে এবং জাতির মনোভাবের সহিত কাব্যের কিরূপ সামঞ্জস্য থাকিবে, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কাব্য আলোচনা করিলে দেখা

যায় যে, বর্ণিত বিষয়সমূহ সাময়িক ঘটনা লইয়া বর্ণিত হইয়া থাকে এ ং তাহার ভিতর দিয়া বহু ভাব ও উদ্দেশ্য প্রদত্ত হয়; সেইজন্য বর্ত্তমানে কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। কাব্যের ভিতর দার্শনিক ভাব সামান্য পরিমাণে থাকা আবশ্যক, কারণ ইহাই হইল মনস্তত্ত্বের মূলস্থান; দার্শনিক ভাব ও মনস্তত্ত্বের বিষয় বিশেষভাবে বিশ্লেষিত না হইলে কাব্যের মাধুর্য্য প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় হইল স্থায়ী ভাব। এমন ভাব বা ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা উচিত যাহাতে ভবিষ্যতের লোকেরা কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। সমাজের স্থায়ী ও কল্যাণকর বিষয়ের চিন্তা ও ভবিষ্যতের উন্নতি ও পরিণতি এই সকল ভাব কাব্যে থাকা আবশ্যক। পরিদৃশ্যমান বস্তুর কিরূপ অর্থ ও পরিণতি হইতে পারে, চিন্তাশীল লেখক নিজের মনের গতি দিয়া তাহা বিভিন্ন প্রকারে দেখাইবেন, অর্থাৎ যেন দৈনন্দিন ব্যাপারের ভাষ্য করিতে হইবে—টীকা করা নয় যে শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিলেই হইল; তাহার অন্তর্নিহিত ভাব পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে। কাব্য দৈনন্দিন ব্যাপারের টীকা নয় ইহা ভাষ্য। সমাজে ও সমসাময়িককালে যে সমস্ত ভাব প্রচলিত হইতেছে তাহাই দেখাইতে হইবে। ইতিহাসে সামান্য এবং সাধারণ ভাবে সমাজের কথা বলা হয়, কিন্তু কাব্যে বৈঠকখানা ঘর হইতে রন্ধনশালা পর্য্যন্ত সকল বিষয় বর্ণনা ও কথোপকথন দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। সমাজের প্রাণ কিরূপ তাহা নানা বাক্যালাপ ও চরিত্র দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। ইতিহাস সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে পরিভ্রমণ করে, কাব্য ইচ্ছামত এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে পারে এবং নানা কক্ষে

ও নানা ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে পারে। সেইজন্য কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বহুপ্রকার, যথা—ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে কাব্যে মুমূর্ষু, শোকার্ত্ত, বিষণ্ণ ও পঙ্গু ভাব দেখাইবার প্রয়োজন নাই। হতাশ ও নিরাশ ভাবে সমাজ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য হতাশ ও নিরাশ ভাব প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই, তবে কেবলমাত্র বিপরীত চরিত্র অঙ্কনকালে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে। চরিত্র দিয়া তেজঃপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সর্ব্বজয়ী ভাব প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। আত্মবিকাশ বা Self-assertion ভাবই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইহাকে অহঙ্কার বলে না, অহংজ্ঞান বলে। চরিত্র নানা বিপদ্ ও বিঘ্নের ভিতর দিয়া, সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া, আত্মনির্ভরতা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়সঙ্কল্প দ্বারা নিজের শক্তি বিকাশ করিবে—ইহাই এখন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক চরিত্রে ও কথোপকথনের ভিতর দিয়া একটা তেজঃপূর্ণ, শক্তিপূর্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত ভাব দেখান কর্ত্তব্য। ইহা হইলে সমাজের ভিতর একটা তেজঃপূর্ণ ভাব আসিবে।

সমাজে দুঃখকষ্ট আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিপন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিলে চলিবে না। চরিত্রে দুঃখের কেবলমাত্র বর্ণনা করিলেই দুঃখের পরিসমাপ্তি হয় না; কি ভাবে সেই সমস্ত দুঃখের নিরাকরণ করা যাইতে পারে, বিপদ্‌কে পদদলিত করিয়া বিজয়ী হওয়া যাইতে পারে, আত্মনির্ভরতা ও আত্ম-শক্তি কিরূপভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায়—সেই সকল ভাব চরিত্র দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। কেবলমাত্র বিপন্ন বা

বিষণ্ণ ভাব দেখাইলেই চলিবে না, বিঘ্নকে অতিক্রম করিবার পন্থা দেখাইতে হইবে। বর্ত্তমানে সমাজের কেন্দ্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বেকার রাজা-মহারাজা বা তাঁহাদের বয়স্যদের হাসি-তামাসার বর্ণনা আর লোকের ভাল লাগিতেছে না। মধ্যবিত্ত লোক, নিঃস্ব দরিদ্র লোক, নিরাশ্রয় ও বিপন্ন লোক—ইহাদের দুঃখের প্রতিকারের, ইহাদের উন্নয়নের, অভ্যুত্থানের উপায় উদ্ভাবন করাই এখন চিন্তার বিষয়, এবং এই চিন্তাই হইল বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। এই স্থলে একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক যে, পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা নারী-চরিত্র দিয়া এই সকল ভাব প্রকাশ করিলে বেশী উপকার হইবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী, বজ্রময়-স্নায়ুযুক্ত ও সর্ব্ববিজয়ী-ভাবপূর্ণ নারী-চরিত্র প্রণয়ন করিলে উচ্চভাবসকল অতি শীঘ্রই সঞ্চারিত হইতে পারে। উচ্চভাব, তেজঃপূর্ণভাব বিকিরণ করিতে হইলে, তাহা নারী-চরিত্রের মুখ দিয়া প্রকাশ করান আবশ্যক; কারণ ইহারাই হইল অনেক ক্ষেত্রে জগতের উপদেষ্ট্রী ও পরিচালিকা। এইজন্য সমাজে সুফল প্রদান করিতে হইলে, বর্ত্তমানে নারীদিগের মধ্যে শক্তিপূর্ণভাব সঞ্চারিত করা বিশেষ আবশ্যক। এই সকল হইল ভবিষ্যতে চরিত্রে অঙ্কন ও কথোপকথনের বাঞ্ছনীয় উপাদান, কারণ সমাজে এইরূপ ভাবের প্রয়োজন হইয়াছে। রোরুদ্যমান, ভগ্নোৎসাহ, নিরাশ্রয় ও বিপন্ন ভাব সমাজে প্রবল হওয়ায়, জাতির মনোভাব নিম্নগামী হইয়াছে। ইহা হইতে হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা উদ্ভূত হয়। মোট কথা, জাতির অভ্যুত্থান ও অভ্যুদয় কিরূপে হইবে, সেই সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। ভবিষ্যৎ-কাব্যের রচনাপ্রণালী কিরূপ হইবে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ

আভাসমাত্র দিলাম এবং কাব্য কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়েও সামান্যমাত্র উল্লেখ করিলাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ ভাবরাশি এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত ও সংযোজিত হইলে নূতন এক শ্রেণীর অলঙ্কার, ভাব ও কাব্য গড়িয়া উঠিবে। জাতীয় মনোভাবকে পরিবর্ত্তন করিয়া উচ্চমার্গে লইয়া যাওয়াই বর্ত্তমানে কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প

(দীপিকা)

প্রথম বক্তৃতা

কাব্য-জগৎ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কাব্যপ্রণেতা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ ধারায় উভয়ের কাব্যের গতি প্রবাহিত হয়। এক শ্রেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইল নানা প্রকার শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা ভাষা পরিস্ফুটিত করা। সাধারণ ব্যক্তিরা ইঁহাদিগের শব্দ ও উক্তি অতি মনোগ্রাহী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে—যাহাকে ইংরাজীতে *trite* and pithy expression এবং বাঙ্গালায় চুট্‌কী-শব্দ ও চুট্‌কী কথা বলে। ইহাতে ভাব-সম্পদ্ সামান্যমাত্র থাকে, কিন্তু কথার জবাব দিবার সময়ে এ-সকল উক্তি উদ্ধৃত করিলে বেশ লোকরঞ্জন হয়। ইঁহারা ভাব বা চিত্রের প্রতি বিশেষ চিন্তা করেন না, শব্দ-বিন্যাসের দিকেই অতিমাত্রায় লক্ষ্য রাখেন। সেইজন্য জনসাধারণের নিকট ইঁহারা অত্যন্ত প্রীতিভাজন হন, এবং সকলের মুখেই তাঁহাদের রচিত বাক্য বা উক্তি সর্ব্বসময়েই কথিত হইয়া থাকে।

অন্য এক প্রকার লেখক হইলেন—চিত্র-কবি। ইঁহাদের বর্ণবিন্যাস এরূপভাবে রচিত হইয়া থাকে, যেন বর্ণিত বিষয়

আলেখ্যের ন্যায় সম্মুখে দৃষ্ট বা প্রতীয়মান হয়। বর্ণিত চরিত্রসকল কিরূপভাবে দাঁড়াইতেছে, কিরূপ বেশভূষা পরিধান করিয়া আছে, বয়স কত, মুখের চেহারা কি প্রকার, গৃহের অভ্যন্তরে কি কি বস্তু আছে, এবং কোন্ সময়ে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সকল বিষয় অল্প-শব্দে অলক্ষিত ও অতর্কিতভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন। চিত্র-কবির বর্ণনা হইতে চিত্রসকল স্পষ্ট পরিদর্শন করা যায়। তাঁহারা যখন যে বিষয় বর্ণনা করিতে থাকেন তাহার চিত্রও সঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপ ফুটিয়া উঠে। চিত্র-কবি বা ভাব-কবির ভিতর একটি বিষয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা জাতির চিন্তারাশির ভিতর নূতন প্রদীপ্তভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।

শব্দ-কবির বর্ণবিন্যাস ও বর্ণিত শব্দের ঝঙ্কার অত্যন্ত সুললিত হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্র বা আলেখ্য চক্ষের উপর স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে না। কোথায় যেন কিছু অভাববোধ হইতেছে, কোথায় যেন কিছু অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, ইহাই পাঠকের মনে বার বার আঘাত করে। কিন্তু ইঁহাদিগের বর্ণ-বিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত বাণী অতি অল্প সময়ে হৃদ্‌গত হইয়া জিহ্বাকে আলোড়িত করে। কারণ-নির্ণয় করিতে হইলে প্রথম লক্ষ্য হয় যে, চিত্র-কবি মনস্তত্ত্ব বা মনোবিদ্যা (Psychology) বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছেন ও পর্য্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্রের মন ও গতি কিরূপে প্রধাবিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাই তিনি বিশেষ করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পান। প্রত্যেক চরিত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী শব্দ ও কার্য্য কিরূপ সামঞ্জস্যভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাই চিত্রিত করা, চিত্র-কবির প্রধান অঙ্গ। গভীর

ভাব, গূঢ় মর্ম্ম, দার্শনিক চিন্তা ও মনোবৃত্তি একসঙ্গে সকলের সমাবেশ হওয়ায় চিত্র-কবির রচনা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও মনোজ্ঞ হইয়া থাকে। কেবলমাত্র কতকগুলি শব্দের বিন্যাস করিলে তাদৃশ রচনা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব ও বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। শব্দ-কবিদিগের ভিতর একটি বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও শব্দের বিকাশ মাতৃভাষায় অতি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু উহা ভাষান্তরিত করিলে শব্দের মাধুর্য্য বিলুপ্ত হয়, সেইজন্য বিশেষ কোন চিত্র ফটিয়া উঠে না। কিন্তু চিত্র-কবির রচনা ভাষান্তরিত হইলে যদিও তাহার মাধুর্য্য অল্প-বিস্তর নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি তদ্দারা পরিকল্পিত চিত্র বহুল পরিমাণে প্রতীয়মান হয়।

গিরিশচন্দ্র ছিলেন চিত্র-কবি। তাঁহার বর্ণিত চিত্রসকল এত স্পষ্ট যে চিত্র-শিল্পী (Painter) অনায়াসেই সেগুলি তূলিকা-দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারেন। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রত্যেক চরিত্র ও চিত্র প্রত্যক্ষদর্শীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্থানে স্থানে স্বল্প-বিস্তর ত্যাগ করিয়া চরিত্রানুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনাতে তাঁহার যেমন প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ছিল, গভীর দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান ছিল, তেমনি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তি ছিল; ইহা ব্যতীত ভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষাও ছিল। সর্ব্বপ্রকার শক্তি ও গুণের সমাবেশ হওয়ায় তাঁহার বর্ণিত চরিত্র ও চিত্রগুলি এত মধুর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ভিত্তিহীন, কেবলমাত্র কাল্পনিক হইলে ইহা এত প্রাণবন্ত হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"বুদ্ধদেব-চরিতে সিদ্ধার্থ

তরুমূলে ব'সে এরূপ তপস্যারত ব্যক্তির ভাষা কিরূপে প্রকাশ করলেন? কারণ বৌদ্ধগ্রন্থ হ'তে এর অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"ছাখ, আমি সিন্ বা চিত্রটার জন্য ক'দিন ধ'রে খুব ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন দেখি যে, এক জীর্ণশীর্ণ-কলেবর মুমূর্ষুপ্রায় যুবক একটা গাছের তলায় এসে ব'সল—যেন খাবি খাচ্ছে। মনে হলো—অল্পক্ষণ পরেই তার দেহত্যাগ হবে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, গায়ের চামড়া হাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। তাকে দেখে তো আমার বড় ভয় হলো। তারপর দেখি, সেই মুমূর্ষু যুবকটি ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কি ব'লতে স্থরু কর্লে—ঠিক যেন স্পষ্ট চক্ষের উপর হ'তে লাগ্‌ল। আমি সেইটি মুখে মুখে ব'লে গেলাম, আর একজন লিখে নিলে।" সেইজন্য বুদ্ধদেব-চরিতে এই অংশটি এত গভীর ও উচ্চাঙ্গের হইয়াছে—

"ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার—
বুঝি তনু হবে ক্ষয়!
সত্য-তত্ত্ব না হ'ল সঞ্চয়—
না হইল মানবের দুঃখ-বিমোচন!
যদবধি দেহে আছে প্রাণ—
করি সত্যের সন্ধান।
ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি—
সৌরভ বিতরি আপনি শুকায়ে যায়;
মৃত্যু-ভয় আছে কি কুসুমে!
উচ্চ শাল, তাল—
অভ্রভেদী শির আনন্দে হেলায়,
অনিলে করিয়ে আবাহন—
রয়েছে মগন আপন আনন্দ-ভরে;

হেরি' জ্ঞান হয়, মৃত্যুকে না করে ভয়।
তরু মম গুরু—
তাপ, হিম, বাত্যা, জল,
শিখায়েছে সহিতে সকল।
আছে সমভাবে,
আত্মকার্য্য নাহি ভোলে;
তবে কি হেতু বা স্বকার্য্য ভুলিব?
মগ্ন হই পুনঃ মহাধ্যানে।
ত্যজিয়াছি সকল মমতা—
জীবনে মমতা কিবা হেতু?"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, ভাব প্রত্যক্ষভাবে সম্মুখে না দাঁড়াইলে তিনি এরূপ সুস্পষ্টভাবে কোন বিষয় বর্ণনা করিতে পারিতেন না। যখন তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন, তখন বাহ্যিক কোন জ্ঞান থাকিত না, কোনরূপ দ্রব্যাদিও দেখিতে পাইতেন না। লিখিবার সময়ে একবারের বেশী দুইবার বলিতে পারিতেন না। কারণ, ভাবসকল ছায়াচিত্রের ন্যায় জীবন্তভাবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া এত দ্রুত চলিয়া যাইত যে, একবার কথাটি ছাড়িয়া গেলে দ্বিতীয়বার তাহার পুনরুক্তি করা সম্ভবপর হইত না। সেইজন্য তিনি স্বহস্তে লিখিতে পারিতেন না। লিপিকার ক্ষিপ্রহস্তে সেই বর্ণনাগুলি লিখিয়া লইতেন। মোট কথা, সেই সময়ে তিনি বিভোর অবস্থায় সম্মুখে একটি জীবন্ত চিত্র দেখিতেন। দৃশ্যমান চিত্রটি যেমন ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিয়া কথা কহিত, তিনিও তদবস্থায় দর্শিত চিত্রের বর্ণিত বিষয়গুলি হুবহু বলিয়া যাইতেন।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করিলে বিষয়বস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে সহজসাধ্য

হইবে। লণ্ডনে তাঁহার বক্তৃতাকালে স্বামী সারদানন্দ ও আমি উপস্থিত থাকিতাম। পিকাডিলিস্থ ওয়াটার-পেন্টিং গ্যালারিতে বৈকালে বক্তৃতা হইত। স্বামীজীর পরমভক্ত ও অনুগত গুড্‌উইন অনতিদূরে থাকিতেন। স্বামীজী আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সহিত সাধারণভাবে বাক্যালাপ করিতেন। গুড্‌উইন নির্দ্ধারিত সময়ের ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে স্বামীজীর কানে কানে বলিয়া যাইতেন যে, বক্তৃতা দিবার আর দুই তিন মিনিট মাত্র দেরী আছে এবং অদ্য এই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইবে। স্বামীজী গুড্‌উইনের মুখের দিকে একবার তাকাইলেন, ঘড়ীতে সময় হইয়াছে দেখিয়া তিনি গিয়া প্ল্যাট্‌ফরমে উঠিলেন। বুকের উপর দুই হাত বাঁধিয়া প্ল্যাট্‌ফরমের উপর ২।১ মিনিট পায়চারি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে তাঁহার মুখের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।—সহসা এক প্রদীপ্ত মহাশক্তিমান্ আজ্ঞাপ্রদ মনীষী হইয়া উঠিলেন। সম্মুখের দেয়ালের ও ছাদের কোণের দিক্‌টাতে চক্ষু স্থির করিয়া, যেন ঊর্দ্ধদিকে কাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছেন—এই অবস্থায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। মনে হইল কোন এক অশরীরী ব্যক্তি অন্তরীক্ষ হইতে আকারে-ইঙ্গিতে যেন কি বলিয়া যাইতেছেন. স্বামীজী তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিয়া বিভোর অবস্থায় অনর্গল বক্তৃতা করিতেছেন। এই ভাবাবস্থায় তিনি যেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইতেন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে স্বামীজী অর্দ্ধ-বিভোর অবস্থায় গুড্‌উইনকে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করিতেন—"গুড্‌উইন, আমি কি ব'ল্লাম তা তো জানিনি, পাগলের মত কি সব ব'লে গেলাম লোকে শুনে তো হাসেনি?" গুড্‌উইন তখন

বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে রচনা উদ্ধৃত করিয়া স্বামাজীকে শুনাইতেন। মনে হইত স্বামীজী কথাগুলি যেন তখন প্রথম শুনিলেন, বক্তৃতাকালীন দেহে যেন মনটা ছিল না সেইজন্য তাঁহার নিজ-মুখ-নিঃসৃত-বাণী তিনি নিজেই শুনিতে পান নাই। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার এই ভাবটি লক্ষ্য করিতাম। ইহাকে বলে চেতন-সমাধি। মহাযোগী স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ভিতরও এই ভাবটি বিশেষভাবে দৃষ্ট হইত। যোগী-হিসাবে বা যোগ-মার্গের চরমাবস্থায় গিয়াছেন সে ভাবে নয়, (কিন্তু তাঁহার ভিতর স্বতঃসিদ্ধ এক শক্তি থাকায় তিনি ভাবদর্শন করিতে পারিতেন। এই কারণে তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলি এত স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।)

গিরিশচন্দ্রের ভিতর একটি বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, চিন্তার সহিত তাঁহার মুখ-ভঙ্গি, চক্ষের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর প্রভৃতি সকলেরই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। কয়েক মিনিট পূর্ব্বে কথা কহিবার সময়ে যেরূপ কণ্ঠস্বর, মুখ-ভঙ্গি ও চক্ষের দৃষ্টি ছিল, কিছুকাল পরেই হয়ত তাহা একেবারে তিরোহিত হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে ভিন্ন কণ্ঠস্বর ও মুখ-ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি প্রকাশ পাইল। স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বদা শ্রোতাদিগকে বলিতেন—"Visualise the ideas. Visualise the ideas", অর্থাৎ ভাবসকলকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন কর। মনকে উচ্চস্তরে তুলিয়া দিলে অর্থাৎ যাহাকে মনস্তত্ত্বে বলিয়া থাকে "ভাবলোক" বা "Region of Ideas" সেই স্তরে মনকে তুলিয়া দিলে ভাবগুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহার নিম্ন স্তরে মন থাকিলে ভাবসকলের দর্শন হয় না।

গিরিশচন্দ্রেরও ভাবানুযায়ী স্নায়ুর বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিত, অর্থাৎ ভাবও তদনুযায়ী স্নায়ুর প্রক্রিয়া এক সঙ্গে হইত। সেইজন্য মাঝে মাঝে তিনি বলিতেন—"ভাবসকলকে স্পষ্ট দেখা যায়।" যোগিগণ ধ্যান-ধারণা করিয়া যে অবস্থায় উপনীত হন, গিরিশচন্দ্র অজ্ঞাতসারে স্বভাবসিদ্ধ-শক্তিবলে সেই অবস্থা পাইয়াছিলেন, অথচ তিনি তাহার কারণ জানিতেন না। দার্শনিক মতে গিরিশচন্দ্রের ভাবসকল বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার মনটা অতি উচ্চ স্তরে যাইতে পারিত। এইরূপ কথিত আছে—"A great man is one who can transform himself in various forms", অর্থাৎ শক্তিমান্ পুরুষ ইচ্ছানুযায়ী নিজের দেহ-মনকে বহুরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। স্বামীজী সর্ব্বদাই বলিতেন—"If I meditate on the brain of Sankara, I become Sankara. If I meditate on the brain of Buddha, I become Buddha", অর্থাৎ শঙ্করের বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন শঙ্কর হয়ে যাই, আবার বুদ্ধের বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন আমি বুদ্ধ হয়ে যাই। স্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্রের ভিতর দেখা যাইত যে, একই দেহের ভিতর বহুবিধ বিবেকানন্দ ও বহুবিধ গিরিশচন্দ্র ভাবানুযায়ী বাস করিতেছে। সাধারণ ব্যক্তি একটি বা তুইটি ভাবের বিকাশ করিতে পারেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ বহু ভাবের ও বহুবিধ দেহের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহারা স্নায়ুসকলকে পরিবর্ত্তন করিয়া ইচ্ছানুযায়ী ভাবসমূহকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারেন, অর্থাৎ তখন ভাব ও স্নায়ু এক হইয়া যায়। গিরিশচন্দ্র অনেক সময়ে গঙ্গার ধারে বা অন্য পথে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেন।

সেই সময়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইত, যেন একটা ফটোগ্রাফের ক্যামেরা বুক ও চোখের ভিতর রহিয়াছে। রাস্তার প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বিষয়ের তিনি একটি হুবহু ফটো তুলিয়া লইতেছেন। এইজন্য তাঁহার সৃষ্ট-চরিত্রের প্রতিচ্ছবি বহুপ্রকার; অসংখ্য রকমের ব্যক্তি ও ঘটনার সমাবেশ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা এত সুস্পষ্ট, সরস ও হৃদয়গ্রাহী, এত স্বাভাবিক ও জীবন্ত, মনে হয় যেন দুই চারি দিন পূর্ব্বে ঠিক অমুক স্থানে এই ঘটনা দেখিয়াছি। ইহাই হইল তাঁহার রচনার প্রধান শিল্পত্ব। বহু লেখকের ভিতর লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে চরিত্র-সৃষ্টি বস্তুতঃ অল্প-সংখ্যক, কেবলমাত্র নাম-ধাম পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যানে সেই সকল চরিত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লেখকেরা প্রত্যক্ষদর্শী নহেন, অনেকটা কল্পনার উপর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কয়েকটি চরিত্র পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, সেই সব চরিত্র বিভিন্ন নামে বিভিন্ন উপাখ্যানে চিত্রিত হইয়াছে। ইঁহাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্বের ক্রমোন্নতি, পরিবর্ত্তন ও সামঞ্জস্যভাব রক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চিত্রিত চরিত্রসকল প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও সহিত মিশিয়া যাইতেছে না। প্রত্যেক চরিত্র বিভিন্ন এবং তাহাদের মনের গতি কিরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত ও বিকশিত হইতেছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞান-হিসাবে তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলি অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক।

মহাভারতের বর্ণিত চরিত্রসকল মনস্তত্ত্বানুযায়ী ঠিক পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং এক চরিত্র অন্য চরিত্রের সহিত

মিশিয়া যাইতেছে না। যেমন বালক ভীম, বালক অর্জ্জুন যেরূপভাবে কথা কহিতেছে যুবা ভীম, যুবা অর্জ্জুনও ঠিক তদনুযায়ী বাক্যালাপ করিতেছে এবং বৃদ্ধ ভীম ও বৃদ্ধ অর্জ্জুন সেই নিয়মানুযায়ী কথোপকথন করিতেছেন। অর্জ্জুন কখন ভীম হইতেছে না এবং ভীমও কখন অর্জ্জুন হইতেছে না। কর্ণ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দুর্য্যোধন প্রভৃতি প্রত্যেককে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকেরই কথাবার্ত্তা ও মনের গতি ঠিক পরস্পরের পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এইজন্য, মহর্ষি বেদব্যাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। ব্যাস হইলেন প্রত্যক্ষদর্শী কবি। ব্যাসের বর্ণনা অতুলনীয়; প্রত্যেক চরিত্র পৃথক্ করিয়া তুলিয়া লওয়া যায়,—অথচ পুঞ্জ-চিত্র (Grouped pictures) করিয়া নানাভাবে সকলকে সংশ্লিষ্ট করিতেছে।

একসঙ্গে বহু চরিত্র কথাবার্ত্তা কহিতেছে, প্রত্যেকেরই এক উদ্দেশ্য, কিন্তু এই স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য হইতেছে যে, প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্যভাব রাখিয়া চলিয়াছে—কেহ কাহারও সহিত মিশিয়া যাইয়া অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে না। ব্যাসের লেখনীর ইহাই হইল একটি প্রধান বিশেষত্ব। গিরিশচন্দ্রের বর্ণিত-চরিত্রসকল ঠিক এই নিয়মেই সৃষ্ট হইয়াছে। তিনিও পুঞ্জ-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—বহু ব্যক্তি নানা ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কত হট্টগোল, গণ্ডগোল হইতেছে, কিন্তু তাহার ভিতর প্রত্যেক চরিত্র নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া নিজের ভাব স্তরে স্তরে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত কেহ এরূপ চরিত্র অঙ্কন করিতে পারে না।

গিরিশচন্দ্রের একাগ্রতা অতি অদ্ভুত ছিল। বোধ হয় এই একাগ্রতা থাকার জন্যই তিনি এত উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিয়াছিলেন। (তাঁহার গ্রন্থে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন যে চরিত্র তিনি অঙ্কন করিতেছেন, বর্ণনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ একাগ্র-ভাব দিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করিতেছেন।) সেখানে উচ্চ বা নীচ বলিয়া কোন বিষয় নাই। যদি কোন উচ্চ বিষয়-বস্তুতে একাগ্রতা না থাকে তাহা হইলে সেই বিষয়টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, কিন্তু যদি অতি ক্ষুদ্র বিষয়ে, অতি তুচ্ছ বিষয়ে, অতি নগণ্য বিষয়ে একাগ্র-ভাব থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত বিষয়-বস্তু অতি মহান্‌রূপে ফুটিয়া উঠে। দার্শনিক-মতে ইহাকে বলে প্রাণ-সঞ্চার অর্থাৎ নিজের ভিতর প্রাণ- বা জীবনী-শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া বর্ণিত বিষয়ের ভিতর তাহা সন্নিবেশিত করিয়া দিতে হয়। চিত্রকর বহুবিধ আলেখ্য অঙ্কন করিয়া থাকেন, কিন্তু যে কয়েকটি চিত্রে প্রাণ-সঞ্চার করিয়া দেন, সেইগুলি জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয়। নিজের প্রাণ বা চেতন-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অঙ্কিত বা বর্ণিত বিষয়ে সন্নিবেশিত করিলে দর্শক বা পাঠক সেই অঙ্কিত বা বর্ণিত বিষয়ের সহিত একীভূত হইলে তাহার ভিতর প্রাণ-শক্তি প্রতিবিম্বিত হয়। সেইজন্য চরিত্র-সৃষ্টি-কালে একাগ্রতার এত প্রয়োজন। বিক্ষিপ্ত বা দ্বিধা-ভাবগ্রস্ত মন লইয়া কার্য্য করিলে বর্ণনা বা চরিত্রসকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। ইহা হইল মনস্তত্ত্বের বিষয়।

উদাহরণ-স্বরূপ গিরিশচন্দ্রের জীবনের সামান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন বৈকালবেলা আমরা গিরিশচন্দ্রের বাটীর উপরকার পশ্চিমদিকের ছাদে বসিয়া

আছি। পশ্চিমদিকের পুকুরটা তখনও ছিল, এবং পুকুরের ধারে কতকগুলি জলের ভারি উড়িয়া বাস করিত। সেই সময়ে তাহাদের কি একটা যাত্রা বা নাচ-গান চলিতেছিল; অনবরত খরতাল বাজাইয়া নাচিতেছিল। তাহাদের এই নাচ-গানের শব্দে আমাদের বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় গিরিশচন্দ্রকে দেখিলাম যে, পশ্চিম-দিকের রেলিং-এর কাঠের গরাদের পর থামটাতে দুই হাতের কনুই রাখিয়া দুই গালে হাত দিয়া তিনি বিভোর হইয়া এক-দৃষ্টিতে সেই যাত্রা দেখিতেছেন-- কোন সংজ্ঞা নাই, কোন দিকে দৃষ্টি নাই। ছাদে কত লোক আসিল, কত লোক চলিয়া গেল, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, যেন দেহ হইতে মনটা বাহির হইয়া উড়েদের যাত্রার নিকট বসিয়া আছে। উড়েদের নাচ, গানের পর্দা, পদবিক্ষেপ প্রভৃতি যেন তিনি গিলিয়া খাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে শোনা গেল যে, তিনি ঐরূপ উড়িয়াদের নাচ-গান রচনা করিয়া একটি নাটকের ভিতর সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপ একাগ্র-ভাব তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী হইতে বহু উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আর এক দিনের ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—একদিন সন্ধ্যার সময়ে গিরিশচন্দ্র একাকী একটি গলি দিয়া যাইতেছিলেন। সম্মুখে একটি আস্তাবল, দেখিলেন তথায় ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী দুই জনেই নেশা করিয়া গল্প করিতেছে। তাহাদিগের গল্পের বিষয়-বস্তু ছিল 'ঘোড়া ভূত'; ঘোড়া ভূতের গল্প বলিতেছে ও পরস্পরে নেশার ঘোরে আবার ঝগড়াও করিতেছে। গিরিশচন্দ্র তথায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের গল্প, হাবভাব, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ের হুবহু ফটো

মনের মধ্যে তুলিয়া লইলেন। সেইজন্য "পাণ্ডব-গৌরব"-এ ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানীর চরিত্র-অঙ্কন এত স্পষ্ট ও মনোরম হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি 'ম্যাক্‌বেথ'-এর অনুকরণে 'প্রফুল্ল' লিখিয়াছেন? কারণ 'ম্যাক্‌বেথ'-এর চরিত্রসকলের সহিত 'প্রফুল্ল' নাটকের মনস্তত্ত্বের বহুল পরিমাণে সৌসাদৃশ্য আছে।" তিনি বলিলেন,—"না, সব চরিত্রই আমার নিজের চোখে দেখা। যোগেশ-চরিত্র সত্য ঘটনা। আমার কাছে ঐরূপ একজন ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসতো; দু'চার আনা নিয়ে চ'লে যেত। তাহার জীবনের ঘটনা অনেকটা ঐরূপ ঘটেছিল।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অলৌকিক পূত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া মুদী-মাকালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত তিনি অভিনিবেশ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি বিশেষ কথা ছিল,—"জগতে ছোট-বড় ব'লে কিছু নাই; প্রত্যেক বস্তুই শিক্ষণীয়, প্রত্যেক বস্তুই মহান্, প্রত্যেক বস্তুই প্রণম্য।" ইহাই হইল গিরিশচন্দ্রের প্রাণশক্তি; ইহাই হইল তাঁহার কৃতিত্বের সোপান।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, গিরিশচন্দ্র বাগবাজারের গঙ্গার ধারে প্রায়ই একা পায়চারি করিতেন এবং সেই সময়ে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত মাঝি-মাল্লাদের কথাবার্ত্তা, হাবভাব ও আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিতেন। তিনি সেই সকল চিত্র নকল করিয়া বিভিন্ন নাটকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'পারস্যপ্রসূন' প্রভৃতি নাটক পাঠ করিলে আমার বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিবেন। 'বাসর' নাটকে ঢুলিদের ও আঁতুড়ের ঝিয়েদের

যে কথাবার্ত্তা আছে, তাহা পড়িলে হাস্য সংবরণ করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ইহা হইল তখনকার দিনের নিখুঁত ছবি। আমি নিজে এই সব বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ইহার ভাষা ও ভাবভঙ্গী অবিকল হইয়াছে। 'সীতার বিবাহে' ভট্টাচার্য্যের বিদায়, বিদ্যা-মুদ্গর মশায়ের টোল, ছ্যাদ্‌না তলায় নাপিতের ছড়া ও স্ত্রীলোকদিগের রঙ্গ তামাসা এবং কনের গহনা লইয়া পাড়ার মেয়েরা যে নানারূপ কটাক্ষ করে, সেই সব চিত্র অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। 'চৈতন্য লীলা'য় জগাই-মাধাই-এর চরিত্র-সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ওটা আমি নিজের ও আমার এক পরমাত্মীয়ের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছি। আমরা দুই জনে যৌবনে ঐরূপ নানা গর্হিত ও অশিষ্ট আচরণ করিয়া বেড়াইতাম। তবে নিজেদের জীবনের যা ঘটনা, তার কতক অংশ বাদ দিয়া জগাই-মাধাই-রূপ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছি।"

'বেল্লিক বাজার'-এ যে দু'কড়ি সেনের কথা আছে, সেই ব্যক্তি বৈকালবেলায় কখন কখন গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আসিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ স্বামী তাঁহাকে লইয়া মাঝে মাঝে আনন্দ উপভোগ করিতেন. কিন্তু আমি তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বড় ভয় পাইতাম। কারণ, কোন প্রকারের গর্হিত কার্য্যই তাহার পক্ষে নিন্দনীয় ছিল না, অম্লানবদনে সে তাহার কুকার্য্যের ইতিহাস মুখস্থ পড়ার মত বলিয়া যাইত। সেই সকল কাহিনী এত বিভীষিকাপূর্ণ যে আমি শুনিয়া কাঁপিতাম। তাহার অভ্যাস ছিল, ট্যাঁকে করিয়া কিছু মটর-ভাজা রাখিয়া দেওয়া, সে ইহাকে 'দোগ্ধ মটর' বলিত। একদিন লোকটি মদ্যপান করিবার জন্য ছটফট

করিতেছিল, সেই সময়ে গিরিশচন্দ্রের ঘরে আসবাবপত্র পালিস করিবার জন্য এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সেই স্পিরিটের বোতলটি আনিয়া একটি গ্লাসে ঢালিয়া তাহাকে পান করিতে দিলেন। সে অম্লান-বদনে জল না মিশাইয়া তাহা পান করিয়া ট্যাক্ হইতে 'দোক্ত মটর' বাহির করিয়া মুখে দিল। সেই ব্যাপার দেখিয়া গিরিশচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"নরেন, ক'র্লে কি? ওটা যে বিষ! লোকটা যে এখনই মারা যাবে।" সে বলিল,—"আ'রে মশাই, ওতে আমার কি হবে? ও আমি নিত্য খেয়ে থাকি।" দু'কড়ি সেনের জীবনের ঘটনা চৌদ্দ আনা বাদ দিয়া দুই আনা হিসাবে তাহাকে 'বেল্লিক বাজার'-এ অঙ্কিত করিয়াছেন।

'হারানিধি' নাটকে কাদম্বিনী বলিয়া যে নারী-চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে তাহাকে আমরা বহুবার দেখিয়াছি। সে মুখে ঘোমটা দিয়া ডুগী বা বাঁয়া বাজাইয়া গান গাহিত। কখন সে সিমলা পাড়ায় কোন গ্যাসের নীচে রোয়াকে বসিয়া গান করিত, কখন-বা বিডন বাগানের ধারে ফুটপাতে বসিয়া গাহিত। পথিকেরা তাহার গান শুনিয়া তাহাকে একটি করিয়া পয়সা দিয়া যাইত। কণ্ঠস্বর তাহার অতি সুমিষ্ট ছিল।

পূর্ব্বে শ্যামবাজারের মোড়ে ধাঙ্গড়দের বস্তি ছিল। গরমকালে ইহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া মাদল লইয়া নাচ-গান করিত। একদল পুরুষ সাজিত ও অন্য দল নারী সাজিত। আমি অনেক সময়ে নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদের নাচ-গান দেখিতাম। তাহাদের নাচ-গান দেখিবার বস্তু। গিরিশচন্দ্রও তাহাদের নাচ-গান নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ

করিতেন, এমন কি সাহেবরাও যাইবার পথে ঐস্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদের নাচ-গান শুনিয়া বকশিস করিয়া যাইতেন। গিরিশচন্দ্র ধাঙ্গড়দের সেই নাচ-গানটা 'চণ্ড'-নাটকে ভীলদিগের নাচ বলিয়া সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছেন। এ-সকল বিষয়ে অধিক বলিবার আর প্রয়োজন নাই। কারণ এ বিষয়ে এত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাহাতে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তকই হইবে। এই কয়েকটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিবার কারণ হইল গিরিশচন্দ্র কিরূপ দৃষ্টি লইয়া পথে পায়চারি করিতেন তাহাই পাঠকবর্গকে জানাইয়া দেওয়া।

জনসাধারণ গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়ন-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁহারা জানেন না যে, গিরিশচন্দ্র কি অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা ও সামর্থ্য অতি আশ্চর্য্য রকমের ছিল। বাল্যকালে তাঁহার পড়াশুনা তেমন হয় নাই, কিন্তু মনের সেই গ্লানিটা অপনোদন করিবার জন্য যৌবনে তিনি অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়া নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি যখন পাঠে রত থাকিতেন, তখন বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র থাকিত না; জীবন্মৃত ব্যক্তির ন্যায় কেবল পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। গৃহাভ্যন্তরে কেহ আসিলেও সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিত না। স্বামী বিবেকানন্দেরও অধ্যয়ন-প্রথা ঐরূপ ছিল, তিনিও যখন পড়িতে সুরু করিতেন, তখন দিনরাত এক হইয়া যাইত। সেক্সপিয়র-নাটকের ব্যাখ্যা গিরিশচন্দ্র বহুবিধভাবে করিতে পারিতেন। কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া কোন্ স্থলে কিরূপ অর্থ হইবে, তাহা তিনি নিখুঁতভাবে দর্শাইতে পারিতেন। ইহাকে অভিনেতাদিগের

ব্যাখ্যা বলা হয়। নাটকের দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে—একটি হইল সাহিত্যের ব্যাখ্যা এবং অন্যটি হইল অভিনেতাদিগের ব্যাখ্যা। প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে অভিনেতাদিগের ব্যাখ্যা অনেক সময়ে পৃথক্ হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রের সময়ে তাঁহার সমকক্ষ সেক্সপিয়রে জ্ঞান অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই দেখিয়াছি। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি একজন বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। যদি নটের ব্যবসা না করিয়া ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ইংরাজী-সাহিত্যে তাঁহার সমকক্ষ অতি অল্প ব্যক্তিই থাকিত। আমি বহু বৎসর গিরিশচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। তাঁহার হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও কথাবার্ত্তা বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতাম; সেইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে যৎসামান্য বর্ণনা করিতেছি।

গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি স্বভাব-নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার সহিত কেহই তর্কযুক্তিতে পারিত না। যে বিষয়েরই কথা উঠুক না কেন, তিনি সেই বিষয়েতে উভয় পক্ষের দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতেন এবং তর্ক করিবার সময়ে যেন রীতিমত একজন নৈয়ায়িক বিচার করিতেছেন, এরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্য ও স্মরণশক্তি থাকায় অক্লেশেই নানারূপ তর্কযুক্তি উত্থাপন করিতে পারিতেন। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রসকল যখন যে-ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে—তাহাতে তর্কযুক্তির কোন ভুল বা ভ্রান্তি হয় নাই। বহু লেখকের বর্ণিত চরিত্রে দেখা যায় যে, ভাব-প্রবণতার সমাবেশ সুন্দর হইয়াছে, কথাবার্ত্তাও বেশ মনোহর, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র- ও

তর্কযুক্তি-অনুযায়ী মাঝে মাঝে ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চিত্রিত চরিত্রে কখনও তর্কযুক্তির ভ্রান্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি স্বভাব-নৈয়ায়িক্ ছিলেন বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট-চরিত্রে নৈয়ায়িকভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের কল্পনাশক্তি ছিল অসামান্য। একদিন কথাপ্রসঙ্গে জনৈক ব্যক্তি পুরীর সমুদ্রের কথা তুলিলেন। তিনি সমুদ্রের ঝড়ের বর্ণনা, ঢেউ-এর বর্ণনা, চাঁদনীর রাত্রিতে সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিলেন। দেশভ্রমণ গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মবহুল জীবনে তেমন ঘটিয়া উঠে নাই। যৌবনে কলিকাতার বাহিরে নিকটবর্ত্তী স্থানে দু'একবার মাত্র গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে মাত্র একবার ৺পুরীধামে ও কয়েকবার ৺কাশীধামে গিয়াছিলেন। যখনকার কথা হইতেছে তখন পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র সমুদ্র দেখেন নাই। তিনি ৺পুরীর সমুদ্রের বর্ণনা শুনিয়া খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর তাচ্ছিল্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"ভারি তো সমুদ্রের কথা ব'ল্লে, ঢেউ ও ঝড়ের কথা ব'ল্লে, ওতো একটা ধ'নের খোলাতে এক ফোঁটা জল! আমার কল্পনা-শক্তি এত আছে যে, হিমালয় পাহাড়ের মত এক্ একটা ঢেউ দেখাতে পারি,—ঝড়েতে সমুদ্রের জল দু-ভাগ ক'রে তা'র তলার বালি দেখাতে পারি। বাস্তব সমুদ্র ঝড়-তুফানে যা না ক'র্ত্তে পারে, আমার কল্পনা-শক্তিতে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখাতে পারি।" কথাটা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া রহিল, কেন-না তিনি সমুদ্রকে ধ'নের খোলার সহিত তুলনা করিলেন। বাস্তবিক এই উপমাটাই এক নূতন ধরণের।

গিরিশচন্দ্রের কল্পনাশক্তি সীমাবিহীন ছিল। কল্পনা-জগতে তিনি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিতেন। তাঁহার কল্পনা-প্রতিভার একটি সুন্দরতম উদাহরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি। 'বুদ্ধদেব-চরিত'-এ সিদ্ধার্থ গোপাকে বলিতেছেন—

"প্রিয়ে,
যত দিন দেখি নাই বদন তোমার,
শূন্যময় হেরিতাম সুন্দর সংসার,
অরুণ-উদয়ে বসি জম্বু-তরুতলে,
শূন্যপ্রাণে শুনিতাম জীবন-হিল্লোল ;
নাচিত ময়ূরী,—
বন-পাখী খেলিত আলোক মাখি' ;
কুরঙ্গিণী কুরঙ্গের সনে
ভ্রমিত অদূর বনে,
দুলিত কুসুমরাজী মলয় মারুতে ;
হেরি' ধরা শোভার আগার,
হৃদয়-বিকার দূর না হইত মম,
ভাবিতাম—লক্ষ্যশূন্য এ সকলি ;
কি পরিবর্ত্তন !—
মধ্যাহ্ন-তপন ভাতিত গগনে যবে,—
নাহি আর আনন্দ-কল্লোল,
অগ্নিময় পবন-হিল্লোল,
রসহীন সরস-কুসুম,
মনে হ'ত ভ্রম,—
ক্ষণস্থায়ী আনন্দে কি ফল ?
পশ্চিম গগন আরক্ত যখন,
নব-ভাব উদয় হইত হৃদে ;

সেই ঊষা-সম ঘটা,
রঞ্জিত সুবর্ণ মেঘছটা,
সেই—সেই, কিন্তু সে ত নয় !
সচকিতে চায়,
বিহঙ্গিনী আনন্দে না গায়,
কুলায়ে প্রবেশে কেহ ।
আশ্রয়ের তরে
ধীরে ধীরে কুরঙ্গিণী ফিরে ;
কভু নির্ম্মল গগন—
হাসে শশী,
রজত-কিরণ ঢালিয়ে ধরণী-পরে ;
কভু নক্ষত্রখচিত রজনী ভূষিত,—
কভু ঘোর মেঘের ঝঙ্কার !
লক্ষ্য নাহি বুঝিতাম তার,—
লক্ষ্যশূন্য সকলি হইত জ্ঞান,—
ম্রিয়মাণ দিবস-যামিনী ।
সুবদনি,
এক ভাবে বহিত জীবন-স্রোত,
হ'ত অনুমান,
চক্রাকারে হয় ঘূর্ণমান,
দিবা নিশি, পক্ষ, ষড়্‌ ঋতু—
যেন নহে নিয়ম অধীন,
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন চক্র ঘুরে ।
এবে প্রিয়ে, হৃদে ধ'রে তোরে
সে বিকার গিয়েছে অন্তরে,
নব আঁখি ফুটেছে আমার !
লক্ষ্যশূন্য নহে এ জীবন,
নয়নে তোমায় হেরি !"

এইরূপ বর্ণনা তাঁহার কাব্য হইতে বহু উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্থলে ইহাই বক্তব্য যে গিরিশচন্দ্র স্বভাব-নৈয়ায়িক হইয়াও অতি উচ্চ স্তরের কল্পনা ধারণ করিতে পারিতেন। নৈয়ায়িকেরা সাধারণতঃ শুষ্ক হইয়া থাকেন এবং কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি তর্কযুক্তি-বিবর্জ্জিত হয়। কারণ এই দুইটি ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। গিরিশচন্দ্র কিন্তু উভয়বিধ বিরুদ্ধভাব একসঙ্গে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন। তাঁহার বর্ণিত চরিত্রে যেমন নৈয়ায়িকের তর্ক-যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়, কল্পনাশক্তির বিকাশও সেইরূপ পরিলক্ষিত হয়। ইহাই হইল তাঁহার কাব্যের এক বিশেষ অঙ্গ।

সামাজিক হিসাবে তিনি অতিশয় নম্র ও মোলায়েম প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোন বিষয়ে প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব বা রূঢ়ভাব তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। বেশী কথাবার্ত্তা কহা তিনি পছন্দ করিতেন না। কথোপকথনকালে অনেকেই বুঝিতে পারিত না যে, সে একজন সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকারের সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। তাঁহার নিকট একটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল যে, গরীবের গৃহে তিনি একেবারে গরীব হইয়া থাকিতে পারিতেন। সকলে যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, সেই বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

গিরিশচন্দ্রের উপস্থিত-বুদ্ধি অসাধারণ ছিল। কোন্ কার্য্যটি কেমন করিয়া সমাধান করিতে হইবে, শুনিবামাত্র তিনি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। সেইজন্য বহু লোক তাঁহার নিকট পরামর্শ লইবার জন্য আসিত। যদিও তিনি অভিনেতার কার্য্য করিতেন এবং নটের ন্যায় বহু ভূমিকা দেখাইতেন, তথাপি

বাড়ীর বৈঠকখানায় যখন থাকিতেন, তখন তাঁহাকে একজন বহুদর্শী গম্ভীর-প্রকৃতির রাশভারি লোক বলিয়া মনে হইত, চাপল্যের কোনরূপ লক্ষণই দেখা যাইত না, তিনি তখন নিশ্চিত ও আজ্ঞাপ্রদভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। বাড়ীতে রঙ্গালয়ের কথাবার্ত্তা সচরাচর কিছু হইত না। অনেক সময়ে তিনি বলিতেন,—"আফিসের কাজ আফিসে, বাড়ীতে সে কথা কেন," অর্থাৎ রঙ্গালয়ই তাঁহার আফিস বা কর্ম্মস্থল ছিল। যখন বাড়ীতে থাকিতেন তখন তিনি পাড়ার একজন কর্ত্তা-ব্যক্তির মতন থাকিতেন। সহরের একজন বিশিষ্ট বহুদর্শী প্রবীণ ব্যক্তি যেমন কথাবার্ত্তা কয়, এবং সকলে যেমন তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপভাবে থাকিতেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা তাঁহার নিকট হইতে নানা রকমের প্রাত্যহিক সুপরামর্শ লইয়া যাইতেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুস্থান হইতে বিভিন্নপ্রকৃতির লোক আসিত। ইহাদের প্রত্যেকেরই সহিত তিনি মিষ্ট ভাষণে আলাপ আলোচনা করিতেন। কেহই অসন্তুষ্ট হইত না, সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইত। প্রত্যেককেই তিনি আদর-যত্ন ও সম্মান দেখাইয়া বিদায় দিতেন। সকলেই মনে মনে বুঝিতেন যে, গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু সমস্ত আলোচনার ভিতর তিনি তাঁহার অভিমত ও বিরাট্ ব্যক্তিত্ব কখনও পরিত্যাগ করিতেন না। নিজের শক্তিমান্ ব্যক্তিত্ব এবং নির্দ্ধারিত মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ভাবে বজায় রাখিয়া, বিপক্ষ দলের মনে আঘাত না দিয়া, কি করিয়া তাহার মতের ভিতর দিয়া তাহাকে উন্নত করিতে পারা যায় ইহাই তিনি সদাসর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। সাধারণ

ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত তর্ক করিতে সাহসই করিত না। অতি অল্প কথার ভিতর দিয়া প্রতিপক্ষকে কিরূপে পরাভূত করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি যে, পাছে প্রতিদ্বন্দ্বী তর্কে পরাভূত হইয়া মনঃক্ষুন্ন হয় সেইজন্য তিনি ভদ্র ভাষায় বলিতেন, "তা বটেও তা বটেও, তা না বটেও তা না বটেও" অর্থাৎ আপনি যা বলিতেছেন তাহা এক দিক্ দেখিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু ইহার অন্য দিক্‌টাও আছে এবং সে দিকেও যথেষ্ট চিন্তা করিবার বস্তু আছে।

রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা ও অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বাড়ীর গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। আমি এই পুস্তকে বাড়ার গিরিশচন্দ্র ঘোষ-সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া যাইতেছি। কারণ তিনি অত্যন্ত মজলিসী ব্যক্তি ছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁহার নিকট এত লোক সমাগম হইত। কেন তাঁহার সহিত বিভিন্নপ্রকৃতির লোক আলাপ-আলোচনা করিয়া পরম-পরিতৃপ্তি লাভ করিত, তাহার একমাত্র কারণ এই যে—একই দেহের ভিতর দশ-বারটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাস করিতেন এবং প্রত্যেক গিরিশচন্দ্রই স্বতন্ত্র-প্রকৃতির; একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ বা সৌসাদৃশ্য ছিল না, প্রত্যেকেই স্বাধীন-প্রকৃতির। একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন, অদ্ভুত প্রতিভাবান্, জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ তাহাও গিরিশচন্দ্র এবং অতি নিম্নস্তরের লোক তাহাও গিরিশচন্দ্র। অনেকে তাঁহার একটিমাত্র ভাব দেখিয়া মত নির্দ্ধারণ করেন, অনেকেই নিজ ভাবানুযায়ী তাঁহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইজন্য তিনি একই

সময়ে সুনাম ও দুর্নাম, যশ এবং অপযশের ভাগী হইয়াছেন। কিন্তু আসল গিরিশচন্দ্র অতি ভালমানুষ ও সরল প্রকৃতির ভক্ত ছিলেন।

কর্ম্মশক্তি তাঁহার অসীম ছিল। নানা বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত ও ব্যস্ত থাকিতেন, ক্লান্তি বা শ্রান্তি বলিয়া কিছু অনুভব করিতেন না। তাঁহার নিজের কর্ম্মশক্তি-সম্বন্ধে তিনি 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—

"ফাল্গুনী সমরক্লান্ত কভু না সম্ভবে।"

যদিও তিনি অতীব কাল্পনিক ছিলেন, তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে কখনও কাল্পনিক হইতেন না, কার্য্যক্ষেত্রে তিনি সুবিবেচক ও সুনিপুণ অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। দুইটি বিপরীত ভাব তাঁহার ভিতর প্রবল থাকায় কার্য্যকালে তিনি এত সফলকাম হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের স্বভাব অতি অকপট ছিল, গুপ্ত বা পোষাকী বা আটপৌরে ভাব বলিয়া তাঁহার নিকট কিছু ছিল না। প্রয়োজন হইলে সরলভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি আমাদের নিকট বলিতেন। যৌবনের উদ্দাম-জীবনের সমস্ত কাহিনী তিনি আমাদের নিকট খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দাম-জীবনের কাহিনীর ভিতর একটি বিষয় বিশেষ করিয়া দেখিতে পাইতাম যে, উপস্থিত-বুদ্ধি ও নূতন প্রকার দুষ্টামার তিনি স্রষ্টা ছিলেন; ভ্যাদ্-ভেদে, এক-ঘেয়ে পুরাতন ঢং-এর দুষ্টামী তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। প্রত্যেক বারে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া নূতন দুষ্টামী করিতেন। তাঁহার দুষ্টামী শুনিয়া লোকে হাসিত ও তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও উদ্ভাবনী-শক্তিকে প্রশংসা

করিত। তাঁহার যে অসীম ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল তাহা তিনি প্রত্যেক দুস্টামীর কার্য্যের ভিতরও দেখাইতেন। ইহাকে বলে জন-নায়কের শক্তি। দুস্টামীর কার্য্যেতেও তিনি জন-নায়ক ছিলেন। কাহারও দ্বিতীয় হওয়া, তাঁহার পক্ষে অসহ্য বেদনাদায়ক হইত। যে গিরিশচন্দ্র পরবর্ত্তী জীবনে বিখ্যাত কবি ও অভিনেতা বলিয়া জন-চিত্তে পূজিত হইয়াছিলেন, তিনি জীবনের উদ্দাম অবস্থায় দুস্টামীতেও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশ করিয়াছিলেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব-ভাব বা আত্ম-বিকাশ-ভাবই গিরিশচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ উপাদান। এই অহং-জ্ঞান বা আত্ম-বিকাশ জ্ঞানটা প্রবল থাকায় সর্ব্ববিষয়ে তিনি নিজের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্যান্-পেনে, ভ্যাদ্-ভেদে, পান্তা-ভাতে ও প্যাত্‌কো ভূতের ভাব তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। ডাঁটো সর্ব্ব-বিজয়ী আত্ম-প্রসারণ-ভাব তাঁহার প্রত্যেক কথাতেই প্রকাশ পাইত, সেইজন্য তাঁহার বর্ণিত চরিত্রের ভিতর এই আত্ম-বিকাশ-ভাবটি পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজ কর্ম্ম-শক্তির উপর এত আস্থাবান্ ছিলেন যে, কখনও বিষণ্ণ হইতেন না। কার্য্যভার যতই গুরুতর হউক না কেন, যতই বিপদ্-বিপত্তি ভীষণ আকার ধারণ করুক না কেন, তিনি নিজ শক্তিবলে প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিতেন। হতাশ- বা বিমর্ষ-ভাব তাঁহার ধাতে ছিল না।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ভাষার প্রয়োজন হয়। ভাষা হইল ভাবের বাহন। জাতির মনের গতি কোন্ সময়ে কিরূপ ছিল এবং ক্রমশঃ কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা অনুধাবন করিতে হইলে সেই জাতির শব্দ, ভাষা ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কারণ, প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন সময়ে ভাষা-গঠন, শব্দ-সংগ্রহ, শব্দ-বিন্যাস ও অলঙ্কারের বিভিন্নপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সেইজন্য জাতির ভাষা ও শব্দনিচয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে জাতির তৎকালীন মনোভাব বুঝিতে পারা যায়।

শব্দকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক হইল সাধু বা দরবারী ভাষা, অন্যটি হইল গ্রাম্যভাষা ও স্ত্রীলোকদিগের ভাষা। সমাজ যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, রাজধানী বা নগরের ভাষা যতই পরিমার্জ্জিত হউক না কেন, গ্রাম্যভাষা ও গ্রাম্য স্ত্রীলোকদিগের ভাষা স্বতন্ত্র ও অপরিবর্ত্তনীয়। গ্রাম্যভাষায় যেরূপ জাতির মনোভাব প্রকাশ করা যায় সাধুভাষার দ্বারা তদ্রূপ পারা যায় না। জাতির অভিজ্ঞতানুযায়ী সংক্ষেপে যে সকল শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই হইল গ্রাম্যভাষা ও গ্রাম্য-নারীদিগের ভাষা। গ্রাম্যভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিলে ঠিক জাতির প্রাণ স্পর্শ করে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যগ্রন্থে গ্রাম্যভাষা কিরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে এইস্থলে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র অতুল সম্পদের অধিকারী। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে সামান্য উল্লেখ করিতেছি।—

মেয়েলী কথা—

"মাথা খাস্ ও মরা মুখ দেখিস্" ... ... (বিল্বমঙ্গল)
"পায়ের মল করে নিব" .. .. (পূর্ণচন্দ্র)
"ঋণ নিতেও আসতে হয় ঋণ দিতেও আসতে হয়।" ... (প্রফুল্ল)
"আমি অপাট্ করেছি, তাই বুঝি ঠাক্‌রুণ খেতে দেবে না?" „
"আমি এদ্দিন টেলে রেখেছিলুম, আর তো টান্‌তে পারিনি।" „
"গতর সুখে থাকুক" ... ... „
"করবো মাথার কিরে" ... ... (সীতাহরণ)
"আড় পাড়িয়ে উঠ্‌ছে" ... ... (বলিদান)
"তোমার মুখে নুড়ো জেলে দিয়েছি" ... ... (বুদ্ধদেব)
"চিমড়ে চিমড়ে গড়ন" ... ... (বিল্বমঙ্গল)
"কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়" ... ... (প্রফুল্ল)
"ভাতার-পুত নিয়ে" ... ... „
"বড় বৌ যা খাওয়ারনি" ... ... „

মেয়েলী ঢংএর ভাষা—

বদরী—"ওগো শোনো—ভাল কথাই বল্‌ছি। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ায় নানা হাঙ্গাম। আমি শুনেছি বছর কতক পা উঁচু করে থাক্‌তে হয়,—বছর কতক পা গাছে বেঁধে ঝুলতে হয়, বছর কতক চারদিকে আগুন জেলে বস্‌তে হয়, বছর কতক খালি হাওয়া খেতে হয়,—বছর কতক গলা ডুবিয়ে জলে বসে থাকতে হয়, অত হাঙ্গামায় কাজ নাই, ও সব করতে গেলে একটা উৎকট ব্যামোস্যামো হয়ে যাবে।"—(তপোবল)

বকাটে ছেলের ভাষা—

"জাঁহাবাজ ছেলে।" ... ...(চৈতন্যলীলা)
"প্রাণটা ঝাপড়দা মাকড়দা করছে।" ... ... (হারানিধি)
"মরি মরি মরি মরার উপর মরি।" ... ... (পূর্ণচন্দ্র)
"কাত্‌লা গা ভাষাণ দিয়েছে।" ... ... (বেল্লিক বাজার)
"বাবা কি বেয়াড়া ছেলেই কেটেছে!" ... ... (বলিদান)
"আরে বাবাজি, আড় ঘোমটা টেনে মুচকি হাসবে।" (বলিদান)
"আমি একলা মায়ের এক ছেলে" ... ... (বলিদান)
"শুন্‌বো শুন্‌বো—ঘাড় একাশি ক'রে শুন্‌বো"...(য্যায়সা-কা-ত্যায়সা)

অশিক্ষিত লোকের সাধুভাষা—

"মন আড়ষ্ট হয়েছে।"
"যেদিন অবধি প্রদর্শন করেছি।"
"অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।"
"একান্ত সুললিত।"
"মাথার কেশ অসিত কল্লেন।"
"অভিপ্রায় বিখ্যাত কচ্চি।"
"সর্ব্বথাই অনটন পাবেন।"
"আপনি অবিভীষিকার মতন বল্লেন।"......(প্রফুল্ল)

জেলেদের ভাষা—

"যেমন মাখাল ফল, তেমনি মাথাল ঠাকুর দেবতা—বিষ গণ্ডা নমস্কার ঠকে জাল ফেল্লুম—ভারি ঠেক্‌লো। ও মা, উঠল কি না হবিষ্যির মালসা, ঐ মাথালকে ডেকেই কাল হয়েছে, এবার কুঁচে কেঁকড়া ডেকে আস্‌বো! সেদিন জাল ফেলেছিলো মোথরো, চিড়বিড়িয়ে যেন খৈ ফুটে গেল।"...(শ্রীবৎস-চিন্তা)

গুড়হাটার মুসলমানের ভাষা—

"খোদা-কশম, বাৎ না উঠাও।
দিল তোড়কে,
দেতা দশ হাজার ছোড়কে।
লেয়াও হাজার আশী,
কম্‌তি কহতো গলেমে লাগাও ফাঁসী!"

(পারস্য প্রসূন)

ভট্‌চায্যির ভাষা—-

"ব্রক্ষণ ব্রক্ষণ ব্যাকারণ লক্ষণ,
সবর্ণে নাক দীর্ঘ
অর্থাৎ সবর্ণের সঙ্গ।
আবে রঙ রঙ রঙ।
আরে ভট্‌চাজ্‌ শাস্ত্রে বলেছে
আকারে পদ্মরাগানাং।
আরে নেও না ব্রক্ষণ ব্রক্ষণ,
বিস্তারত্বং মহাধনং।" (সীতার বিবাহ)

মুদ্দফরাসের ভাষা—

"সেলাম বাবু, পছাস্তে পার,
আমি সে বুড় আছে, সে রাম আছে,
সে রামা আছে। আপনাকো মেহেরবানিসে
গুজরান হতো, আর বাবু উবু মরে না,
যত শালা উড়িয়া লোক মরছে।" (বেল্লিক বাজার)

মাতালের ভাষা—

১ম। এই বাবা! মেয়ে মানুষ কৈ বাবা!
প্রেয়সী এখানে? (পাহারাওয়ালাকে জড়াইয়া ধরা)

২য়। (দরওয়ানজীর টিকি ধরিয়া)
ইস্ বেটী যেন ভট্টচাষ্যি।—
৩য়। (মোহিনীকে ধরিয়া) প্রাণ-প্রেয়সি,
কাঁদ্‌ছো কেন বাবা, আমি তোমায় বর্ষাটা
গেলে নথ্ গড়িয়ে দেবো। (হারানিধি)

সাপুড়িয়ার ভাষা—

"কেন আইল নিদির ঘোর রে—আইল নিদির ঘোর।
কালনাগিনী কেটে গেল সোনার লকিন্দর রে,
সোনার লকিন্দর।"
(গিরিশ-গীতাবলী)

বিদূষকের ভাষা—

"মিন্‌সে খেপেনি, রাজ্যিশুদ্ধ খেপেছে, কেউ বল্‌ছেন বাবা রক্ষা কর, কেউ বল্‌ছেন বিপদভঞ্জন—দূর হোক্ সকালবেলা আর ও নামটা করবো না। ওরে আবাগের বেটা বেটীরে! বসে মা কানের মাথা খেয়ে শুয়ে আছে, জেগে আছেন কেবল দামোদর, তা যা কর্‌বার তা করে যাবেন।" (জনা)

সাঁওতালী ভাষা—

"কাঁড়া সাড়া দিলে খাড়া দাঙ্গা মিলে
কাড়ি বুড়ী বোলে যায়,
কুড় কুড় ঝাইরে কুড় কুড় ঝাই—
বড় মিঠা লড়াইরে মিঠা লড়াই
হাল্লা ওঠে গরমি ছোটে,
জোটে জোটে ধাই,
সাঁই সাঁই সাঁই রে সাঁই সাঁই সাঁই
বড় মিঠা লড়াইরে বড় মিঠা লড়াই।" (চণ্ড)

ঝিয়ের ভাষা—

"ওমা গো, সমস্ত রাত কি তোলালে গো। গন্ধে গা-টা আড়পাড়িয়ে উঠ্ছে। থাক্ এখন বাসনমাজা, বাবুর ঘরটায় ঝাট্ দিয়ে নেয়ে আসি। মাগো, বড়দিদিমণি কি নিঘিন্নে, দুহাতে তোলানীগুলো ধর্লে। কি চিক্কুরী গো, কানে তালা ধরে যায়। চলে গেল———বালাই গেল। আমাদের ঘরকে ওমন জামাই হলে মুয়ে নুড়ো জ্বেলে দিই।

(বলিদান)

দারোয়ানী ভাষা—

হাঁ হাঁ ডাণ্ডাসে বাঁনাইয়ে দেগা।

সব্ ভ্রষ্ট্ হ্যায়।

আচ্ছা,—ঘিউ লেয়াও, আটা লেয়াও, অহরকি ডাল লেয়াও।"

(হারানিধি)

গ্রাম্যভাষা—বেল্কোপনা, গুবরেপোকা-ছেলে, থুতকুড়ি, চিম্ড়ে ছুঁড়ী, হেঁসেলের কোণে, এগুনে, ভোর-যামিনী, টট্টারয়ে, চিক্কুরী, কুপোকাৎ, কোঁতড়া-গুড়, বন্দে-হাজির, যখন ঝড়বে মেঘা ঝুপর ঝুপুর, টুয়্নো রাঁড়ীর মাঠে যাব, পাঁদাড় থেকে ডাক্ছে বোড়া, কোলা ঐ ফ্যারকা জিব্টা মেলে, উদোম গায়, ভোর কোঁচড়ে, মাগী, চাকুম্ চাকুম্, ডাগরা নাগর, বরণ-দু-পোড়, বাদার-বিল, আড়ঘোমটা, ডুবু ডুবু হবে চাকি, ইদুর বেঁড়ে, নৌকা দেবে ফেঁড়ে, স্বত্ব শুষে খেয়ে, ভেকো ভ্যাকা, জবু থবু হয়ে, ভুতো পুতো, নাচোন্ কোঁদন্, কাঁদি কাঁদি মানুষ, উদোমাদা, বিয়ে, কোড়া, গোমড়া, ভাঁড়াভাঁড়ী, এড়াইয়া, সোঁদা ব্রাহ্মণের ছেলে, চিম্ড়ে চিম্ড়ে গড়ন, আড়পাড়িয়ে, তোলানী, নিঘিন্নে, উপ্ড়ে নেব, গোম্ড়া-গোমড়া।

মাঝি-মাল্লার ভাষা—

"ঈশান কোণে ম্যাগ উঠ্যাছে কত্তিছে গোঁ গোঁ, ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো।"……(কমলে কামিনী)

হিজড়াগণের গীত—

"কেলে গোপাল দোলে কোলে।
কেলে ছেলে আলো দিচ্চে ঢেলে ॥
হিজড়া নেবে ছেলের আলাই বালাই,
জীও খোকা কালীমায়ীর দোহাই ;
নেব জোড়া টাকা, নেব জোড়া সাড়ী,
না পেলে হিজড়া ফিরবে না বাড়ী,
খোকা নিয়ে বুকে, চাঁদ মুখটা দেখে,
লাখে লাখে চুমো দে কেলে চাঁদের মুখে,
মার কোল জুড়ে খেলবে কেলে ছেলে ॥" (নন্দদুলাল)

হিজড়াদের ভাষা—

"বালাই—বালাই, খকা বেঁচে থাক্ খকা বেচে থাক্
পাঁচ পোয়াতির আশিস্ নিয়ে খকা আছে ভাল।
খকা কোল্ করেছে আলো মায়ের কোল করেছে আলো ॥

ট্যা ট্যা এইটে ছেলের বাপটা! ও মানা করতে থাক্‌বে ও মানা করতে থাক্‌বে—আমরা গান ধ'রি মানা ক'রো ঠাকুর, মানা ক'রো ঠাকুর।"...(বাসর)

শিউলীর ভাষা

শিউলী—"আ গেল যা, আমি বল্‌চি—আমি বামুণ নই। বামুণ দেখ্‌বি তো চ—দেখাইগে। তোর কাঁথাকে কাঁথা কেড়ে নিবে। আমি তাই ভয়ে বামুণের ছাঁই মাড়াইনি। আর যদি জোয়ান বৌ-ঝি দেখছে তো অম্‌নি নোলা সক্‌সকিয়েছে। বৌ-ঝিরা রাত করে সব জলকে যায়,—নইলে টেনে নিয়ে চল্লো। মদ খাওয়ালে, জবাফুল পরালে, এই এমন বাধায়ের বাধায়ে এই বামুণগুলো। বুঝলি—জাত জন্ম আর রাখেনি।" (শঙ্করাচার্য্য)

শিউলিনীর ভাষা—

শিউলিনী—"আর মা সে কি মুঙে ভাত দেই—আমি যে তার ডরে ঘরকে কানিনি, বুকে পাথর বেঁধে থাকি, আমাকে কান্‌তে দেখ্‌লে সে ভেউ ভেউ করে কানে, তাই—ইখানকে কান্‌তে এনু। আমার সে চাঁদা গিয়েছে, আমার পরাণটা এখনে রয়েছে। এতক্ষণকে সে পালা কুড়িয়ে ঘরকে আস্‌তো খাবার নেগে হুজ্জুত কর্‌ত্তো, বড় বান্দেরে ছ্যালো।" (শঙ্করাচার্য্য)

চণ্ডালের ভাষা—

চণ্ডাল—"তোরা লোককে হামি বল্‌লে যে, মাগী ছটার পিছ্‌লে, ও হামাদের চাঁড়াল ঘরের জেনানা নয়। ডর মারে ভাগ্‌চে—ভালমামুষের জেনানা। দেখ্‌তো কত বুরা বাত হলো। বনে কাঁহা ঘুসে যাবে, বাঘা টাঁসাবে।"

(অশোক)

চণ্ডাল-পত্নীর ভাষা—

চণ্ডাল-পত্নী—"চল্‌ চল্‌, ঘরে লিয়ে যাব। বেটী নাই, বেটা নাই, হামার ফাঁকা ঘর আলো কর্‌বে! (পদ্মাবতীর প্রতি) আরে, তোর বেটাকে কি খিয়ালি? হামার পাশ মউ আছে, মিন্‌ষেকে সরবৎ পিয়াবো, তাই চাক তুড়েছি, দে, দে, নাতি কোলে দে—খিয়াই।............এর আর সলা কর্‌তে লার্‌লি, কাটকুটা চাপায়ে দে, বেটী হামার জ্বালান্‌ ক'রে দেবে।"

নূতন শব্দ-গঠন—

ফল্লী-ফল্ল-ফণা, গঙ্গা-বিলোলা, নিন্দি-কলেবর, ধবল-তুষার-জিনি, নক্ষত্রবেগে ধাইল রথ, মন-বিভোরা, সাংসা থাকি, দ্বিদল-জীবন ইত্যাদি

উকিল-ডাক্তারের ভাষা—

(খুদিরাম উকীল)—"কিছুই তো ক'রে উঠ্‌তে পারিনি, ভাই, টাইম্ বড় খারাপ পড়েছে। সেন্স-অব রাইট্ লোকের নাই; আগে শুনেছি, একটা গাছের ডাল নিয়ে ক্রোর টাকার প্রপার্টি পার্টিসন হয়ে গেল—ফ্যাক্ট, তাদের ছেলেরা এখন সার্ভিং ক্লার্কগিরি করছে।

(বেল্লিক বাজার)

(পুঁটিরাম ডাক্তার)—স্থধু ব্যাড্ টাইম্। এ কন্‌ট্রাই ব্যাড্। আমার একটি ফ্রেণ্ড বিলেত থেকে এসেছে, তার মুখে শুন্‌লেম, সেখানে রোগ ক্রিয়েট্ করে, সে ছ'মাস ছিল, তার ভিতর দেখে এসেছে সত্তরটা নূতন রোগ তয়ের হ'লো; আরও ডাক্তারদের কত দিকে কত লাভ, ডিস্পেনসরীর কমিশন, মদের দোকানের কমিশন, বুচারের দোকানের কমিশন, ডাক্তারের রেকমেণ্ডেসন ছাড়া কি মিট, কি ড্রিঙ্ক কিছুই ইউজ করে না।"

(বেল্লিক বাজার)

যজ্ঞে ন্যায়রত্ন-তর্কালঙ্কারের কলহের ভাষা—

ন্যায়রত্ন—"নে নে—তুই বাচস্পতি খুড়োকে পুঁথি দে, তোর ব্যাকরণ বোধ নাই, তোর মুখে আবৃত্তিই হয় না, তুই আবার পুঁথি ধর্‌বি?

তর্কালঙ্কার—কি বল্লি পাষণ্ড!—আমি ব্যাকরণ জানিনি, কিলিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেবো জানিস্? আমি ঢের বাচস্পতি দেখেছি! দেখি দেখি, কে আমার আসনে এসে বসে! —এতে যজ্ঞ হয় হোক্ আর না হোক্।

বাচস্পতি—ওহে চঞ্চল হয়ো না, চঞ্চল হয়ো না। বেদ-বিধিমত উচ্চারণ আবশ্যক। বিদ্যা চাই হে—বিদ্যা চাই। ধর্ম্ম-নিষ্ঠা চাই—" (নন্দদুলাল)

গণকদ্বয়ের ভাষা—

১ম গ। কি বল ভট্‌চাজ,
শনি আছে কর্কটে।
২য় গ। ঠিক বলেছ বটে বটে বটে।
১ম গ। ভট্‌চাজ রাজার বাড়ীর গোণা—
এবার বিদ্যা যাবে জানা।
২য় গ। দণ্ড, তিথি, পল,
পঞ্জিকায় দেখেছি সকল।
১ম গ। এতে কি রাজার বাড়ীর গোণা হয়?
কর্ত্তে হবে হয়কে নয়!
বল্‌তে হবে ঠিক্‌ঠাক্‌,
রাহু কেতুর কত বাঁক।
গুণতে হবে পলে পলে,
মেয়ে হবে কি হবে ছেলে।
২য় গ। ও সকল কিছু আছে দেখা,
বল্‌তে পারি শাস্ত্রের লেখা;
দক্ষিণে রাহু কেতু বাম,
যোগ কর্‌বে ফুলের নাম;
ভাগ কর্‌বে কুজের তিনে,
দেখবে মঘা রেতে কি দিনে।
তাতে যদি শূন্য থাকে,
ফিরতে হবে শূন্য ট্যাঁকে;
ভাগে যদি দুই বাড়ে,
দৌড় দেবে গঙ্গার পারে।" (বুদ্ধদেব চরিত)

দালালের ভাষা—

দোকড়ি সেন—"হালারা নাস্তিক্, বরদিনের দিন গঙ্গার বন্দনা গান করছে। বগবান্ মিথ্যা, এই সব হালা মদ খেয়ে ডুগী বাজায়ে বাগান চল্‌ছে, আর দোকড়ি সেন উমি লোকের মত দারায়ে তামাসা দেখছে। হালার পুতিরা বিলাতি খোল মাথায়ে ফৌলবাজা খাবে, আর আমি বাসায় গিয়া চিরা গুর চিবাইব। এ মাগুর ভাই দু'হালারে জুটাইলাম কেন, টাকা প্রস্তুত প্যামেণ্ট করি, আর সব ফাস—বগবান্!'

(বেল্লিক বাজার)

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রচলিত শব্দের উপর গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত আধিপত্য ছিল। বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক বর্ণের লোকের কিরূপ ভাষা ও আচরণ, তাহা তিনি অতি সংক্ষেপে ভাষা বা শব্দ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ভাষাজ্ঞান,—ব্যক্তি ও স্থান-বিশেষে শব্দ-বিন্যাস, জগতে অতি অল্প সংখ্যক লেখকের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু শব্দ নহে, বলিবার ভঙ্গি এবং উচ্চারণও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কি ইংরাজের বাংলা, কি আরমানির বাংলা, কি নবাবী বাংলা, কি দুলে-বাগ্দীর বাংলা, কি গুড়হাটার মুছলমানের বাংলা, কি জেলে মালোর বাংলা, কি মাঝি-মাল্লার বাংলা, কি ভট্‌চাজ্জির বাংলা, কি বকাটে ছোঁড়ার বাংলা, কি ইংরাজী শিক্ষিত নব্য বাবুর বাংলা, কি ঢাকী-ঢুলী, কি মুটে-মজুর, গাড়োয়ান-সহিস-কোচ্‌ম্যানের বাংলা, কি দারোগা-দ্বারোয়ানের বাংলা, কি গুরুমশাইয়ের বাংলা, কি মাতালের বাংলা, কি আঁতুড়ের ঝিয়েদের বাংলা—বহুবিধ-শ্রেণীর শব্দ, বাক্যবিন্যাস ও উচ্চারণ তিনি নিখুঁতভাবে

লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত যত শ্রেণীর নরনারী বাঙ্গালাদেশে বাস বলে, তাহারা নিজ-শ্রেণীর ভিতর কিরূপ-ভাবে কথাবার্ত্তা বলে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে অনুরূপ ছায়াছিত্র (Photo) রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি মেথর-ঝাড়ুদার ও শ্মশানঘাটের রামা মুদ্দফরাসের উচ্চারণও অনুরূপ শব্দ দিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী বাঙ্গালাদেশে বসবাস করিয়া কিরূপ বাংলা ভাষা উচ্চারণ করিত, তাহাও তিনি দর্শাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে নারীদিগের ভাষা এক অতুলনীয় সম্পদ্! কি প্রৌঢ়া, কি যুবতী, কি কিশোরী, কি বালিকা প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বয়সানুযায়ী সঠিক্ ভাষা ও উচ্চারণ-ভঙ্গি তিনি সুন্দরভাবে দর্শাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতত্ত্ব বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া একখানি অভিধান রচনা করিলে বাঙ্গালা ভাষার অস্থিমজ্জা কোথায়, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কেবলমাত্র অভিনয় দর্শন করিলে চলিবে না--তৎসহিত প্রত্যেক গ্রন্থখানি, প্রত্যেক কাব্যখানি টীকা ও ভাষ্যসহ নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করিতে হইবে। ইহা হাসি-কৌতুকের সামগ্রী নহে। বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশে এক প্রখর ধীশক্তি-সম্পন্ন তেজস্বী মনীষীর চিন্তারাশি যাহার ভিতর ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়ান ও মাখান আছে তাহাই গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। অনেক সময় তিনি তাঁহার চিন্তার ধারা চাপল্য ও হাসি-কৌতুকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের উদ্দেশ্য অনেক সময় বুঝিতে না পারিয়া, হাসি-কৌতুকের সামগ্রী বলিয়া জনসাধারণ গ্রন্থ পড়িয়া থাকে, কারণ,

অভিনয়-কালীন হাস্য-কৌতুক ও অঙ্গ-ভঙ্গিমাদির প্রাধান্য থাকায় রচনার অদ্ভুত শক্তি দর্শকের চক্ষে তত প্রতিভাত হয় না। কিন্তু সেই কাব্যগুলি যদি ভাষা ও রচনার দিক দিয়া অধ্যয়ন করা যায় তাহা হইলে তাঁহার কবিত্বশক্তি, রচনা ও ভাষা-নৈপুণ্যের সুদক্ষ ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়—তাঁহার কি অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তাহা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার বর্ণিত চরিত্র-সকল একসঙ্গে সমাবেশ করিলে বহুশত নরনারী দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক অঙ্কিত চরিত্র অতি স্পষ্ট, মনোরম ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গিরিশচন্দ্র স্বয়ং বহুশত রূপ ধারণ করিয়া অঙ্কিত চরিত্র-গুলির ভিতর নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ এক গিরিশচন্দ্র বহুশত গিরিশচন্দ্র হইয়াছেন। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে হইলে, এইরূপ বলা যায় যে, তিনি তাঁহার মনকে উচ্চে তুলিয়া দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক অংশ বর্ণিত চরিত্রের ভিতর প্রবেশ করিত, এবং অনুরূপ শব্দ, বাক্য-বিন্যাস, অঙ্গসঞ্চালন ও ভাবভঙ্গি দিয়া মনোভাব প্রকাশ করিত। ইহাই হইল দ্রষ্টব্য বা ধ্যেয় বস্তু। অপর অংশ নিজের ভিতরে থাকিয়া দ্রষ্টা-স্বরূপ হইয়া দ্রষ্টব্য বিষয়কে স্পষ্ট দর্শন ও অনুধ্যান করা। একই গিরিশচন্দ্র দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া কল্পিত-চরিত্র ও লেখক হইতেন। অর্থাৎ কাব্য ও কবি এক—কবিই কাব্য, কাব্যই কবি। দু'মনা হইয়া বর্ণনা করিলে সৃষ্ট-চরিত্রে শক্তির পূর্ণ-বিকাশ হয় না। সেইজন্য একই দুই হয়, দুইই এক হয়। গিরিশচন্দ্র যে কত

বিষয় ভাবিয়াছিলেন, চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্যগুলি নিবিষ্টমনে শ্রদ্ধাযুক্ত-চিত্তে অধ্যয়ন করিলে তৎসমুদয় বিশদ্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এই সমস্ত গ্রন্থরাশির ভিতর তাঁহার চিন্তাজগতের পরিণতি ও সমাধান সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও তিনি উচ্চাঙ্গের তত্ত্বরাশি বিশদভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তথাপি দার্শনিকের কঠোর নীরস-ভাব তাহাতে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। তৎপরিবর্ত্তে ঐ সমস্ত কূট ও দুরূহ তত্ত্বরাজি অতি সহজ, সরল, সরস ও চিত্তাকর্ষণী ভাষায় হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়া জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রসসৃষ্টির ভিতর কোন কস্ট-কল্পনা নাই বলিয়া জনসাধারণ এত সহজে মুগ্ধ হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র গ্রাম্য-ভাষা ও প্রচলিত-ভাষার আশ্চর্য্য কোবিদ ছিলেন। প্রচলিত শব্দে যে অসীম শক্তি আছে তাহা তিনি স্পষ্টই দর্শাইয়া গিয়াছেন। চল্‌তি বাঙ্গালা ভাষার তিনি জীবন্ত অভিধান ছিলেন। আমরা যখন তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতাম তখন দেখিতাম যে, সাধারণ গ্রাম্য-ভাষা, মেয়েলি-ভাষা, দাসীর ভাষা, মাঝি-মাল্লার ভাষা প্রভৃতি তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন। সময় সময় ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, তিনি একটু উত্তেজিত হইলে কবিতায় বা ছন্দে মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। আলোচনার সময় তিনি ইংরাজী শব্দ বিশেষ ব্যবহার করিতেন না, অভিধানের শব্দও বিশেষ থাকিত না; প্রচলিত শব্দে অনায়াসেই তিনি সমস্ত বক্তব্য বিষয় অনর্গল বলিয়া যাইতেন। সেইজন্য গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বিদেশী ভাষা ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ

করা বড়ই কঠিন। তাঁহার ভাষা রূপান্তরিত করিলে ঠিক্ অনুরূপ শব্দ পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তিনি চিত্রকবি ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র বিভিন্ন ভাষায় দেখান যাইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার যে মাধুর্য্য, খড়ের ঘরের ভিতর বাঙ্গালীর যে প্রাণ আছে, চাষার ভাষায়, জেলের ভাষায় যে অসীম প্রাণবন্ত শক্তি আছে, ভাষান্তরিত করিলে তাহার রসমাধুর্য্য সমূলে বিনষ্ট হইবে। অভিধানের ভাষা, দরবারী-ভাষার গ্রন্থ সহজেই অনুবাদ করা যায়, কিন্তু ঢুলির ভাষা বা আঁতুড়ে-ঝিয়ের ভাষা অনুবাদ করা সহজসাধ্য নহে। সেইজন্য গিরিশ-চন্দ্রের গ্রন্থাবলী বা ভাবরাশি বর্ত্তমানে বাঙ্গালার বাহিরে তাদৃশ প্রচলিত হইতেছে না।

গিরিশচন্দ্র অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, তাহার একটি প্রধান কারণ হইল, পরমহংস মশাই কখন গিরিশ-চন্দ্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। পরমহংস মশাই সর্ব্বদাই বলিতেন,—"স্বাধীনভাবে মানুষ বাড়তে পারে।" গিরিশচন্দ্র স্বাধীন ভাবের ভাবুক ছিলেন, সেইজন্য পরমহংস মশাই ও নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার এত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। নিকৃষ্ট ও উচ্ছিষ্টভোজী ভাব তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি সেক্সপীয়র হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দেশী-বিদেশী গ্রন্থ অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখন কাহারও অনুকরণ করেন নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র-সকল তাঁহার নিজ কল্পনাপ্রসূত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার কথাবার্ত্তায় অভিধানের শব্দ বা সাধু-ভাষা কখনও ব্যবহার করিতেন না, গ্রাম্য

প্রচলিত শব্দ-দ্বারা উচ্চাঙ্গের ভাবরাশি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদা-হাস্যবদনের সরল সাদা বাঙ্গালা কথায় উচ্চাঙ্গের ভগবৎতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। গিরিশচন্দ্রেরও তদ্রূপ ভাব ছিল। যাঁহারা মনস্তত্ত্ব (Psychology) ও ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের এ বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। কারণ জাতির ভিতর নূতন ভাব, নূতন স্পৃহা, নূতন জাগরণ আসিয়াছে। যে ভাষা সহজে নর-নারীর মনকে স্পর্শ ও সতেজ করে তাহাকেই প্রাণবন্ত ভাষা বলা যায়।

ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রাকৃতিক শব্দ বা Onomatopœia ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যথা :—

"ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ নৌবত বাজে।
ঘন্ ভোরঙ্গ ভম্ভম্, দামামা দম্ দম্
ঝনন্ ঝম্ ঝম্ ধাজে॥
কত নিশান ফরফর নিশাদ ধর্ ধর্
কামান গরগর গাজে।
সব যুবান রাজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে॥

ধূ ধূ ধম্ ধম্ ঝঁ ঝঁ ঝম্ ঝম্
দামামা দম্ দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে॥
দল বল সঙ্গে পুনরপি রঙ্গে
চলে মানসিংহ রায়।" ইত্যাদি

ইহা তাঁহার প্রথম উদ্যম, সেইজন্য তত সুন্দর হইতে পারে নাই; তথাপি এই প্রথম উৎসাহ বা প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয় নিঃসন্দেহ। গিরিশচন্দ্রই এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দর্শাইয়াছেন। তাঁহার "বুদ্ধদেব-চরিত" নাটকে এই Onomatopœia-র সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। যথা :—

"কোঁ কোঁ কোঁ বও রে ঝড়্,
ডাক্‌রে আকাশ কড়র্ কড়র্ কড়্;
তড়্ তড়্ তড়্ পড়রে জল,
দে পৃথিবী রসাতল;
নরক থেকে আয়রে ঝেঁকে,
নৃত্য কর্ এঁকে বেঁকে,
লক্ লক্ জল আগুন শিখে,
হাততালি দে বিভীষিকে;
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ আয় রে আঁধার,
কাঁপরে মাটী এধার ওধার;
খস্‌রে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে,
পড়্‌রে পাহাড় লাখে লাখে;
উথ্‌লে উঠ্ বিষের ঢেউ,—
বেঁচে যেন না যায় কেউ;
আয় চলে জল সাগর থেকে,
চন্দ্র সূর্য্য ফাল্‌বে ঢেকে।"

এইরূপ ঝড় ও মহাপ্রলয়ের বর্ণনা অন্যান্য কবিদের ভিতর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতচন্দ্রের বর্ণনা হইল যথা—

"ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড়্ তড়্ ঝড় বহে ঝড়্ ঝড়্
হড়্ মড়্ কড়্ মড়্ বাজে॥

দশদিক অন্ধকার করিলা মেঘগণ।
দুণো হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্চনার ঝঞ্চনী বিদ্যুৎ চক্‌মকী।
হড়মড়ী মেঘের ভেকের মক্‌মকী॥
ঝড়মড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥
থরথরী স্থাবর বজ্রের কড়কড়ী।
ঘুটঘুট অন্ধকার শিলার তড়তড়ী॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট্ ডুবিল তাম্বুতে এলো বান॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে পড়া গেল গাড়ী উঠে তায় সাথী॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তরবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মাল মাত্তা উরুদু বাজার॥
বকড়ী বকড়া মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥"

ইহা হইল দরবারী ভাষায় লেখা। ইহাতে ঝড়ের বর্ণনা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উপরোক্ত বর্ণনাটি অতি চমৎকার হইয়াছে। তাঁহার "বুদ্ধদেব-চরিত" হইতে আর একটি সুন্দর বর্ণনা নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্
গেল মাগী মারা—
(রাণীর মূর্চ্ছা)

ছেলে ছেলে ক'রে, হ'লো দিশে-হারা,
ভাখ্ না ভাখ্ না বোঝ্ না বোঝ্ না,
ধিক্ ধিক্ ধিক্!
খেলে খেলে খেলে, খেলে ওরে ছেলে,
বাঁচে না বাঁচে না একথা ঠিক্।
তাই তাই তাই তাই বলে যাই,
কথা যদি শোনে তবু বাঁচে ছাই ;
যাই যাই যাই, তাকাই তাকাই,
মিছে—একি বাঁচে, আর কাজ নেই ;
ওই যমদূতে এলো ওরে নিতে,
হী হী হী হী হাসে ফিক্ ফিক্ ফিক্।"

ভূতের কথা তো যথার্থই ভূতের মতন হইয়াছে। "জনা" নাটকে গঙ্গারক্ষকদিগের যে কথোপকথন আছে তাহাও অতুলনীয়। নাকী-সুরে তাহারা যেরূপভাবে কথা কয় তাহাতে জনসাধারণের মনে যথার্থই ত্রাস আনিয়া দেয়। গিরিশচন্দ্রের প্রাকৃতিক শব্দানুযায়ী ভাষা বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব বিখ্যাত রচনা বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভারতচন্দ্র 'শিবের স্তবে' তিনি এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা :—

"শঙ্করায় নম নম গিরিসুতা প্রিয়তম
বৃষভ-বাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন সুশোভিত ত্রি-নয়ন
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি॥
হর হর নর-দুঃখ-হর।
হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ
হিমকর শেখর শঙ্কর॥

গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেতভূত অগণন
সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়॥" ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রকে এইরূপ ভাষার প্রথম স্রষ্টা বলা যাইতে পারে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের লেখনীতে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এইস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, গিরিশচন্দ্র বাজার-চলিত শব্দসকল খুঁটিয়া তুলিয়া লইয়া অমূল্য শিরস্ত্রাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক জাতির মনোভাব নির্ণয় করিতে হইলে সেই জাতির বিভিন্ন সময়ের ছন্দের আলোচনা করা প্রয়োজন। জাতির প্রাথমিক অবস্থাতে ছন্দ এক প্রকার হইয়া থাকে। সেই জাতির মনোভাব যখন গভীর হইল, জাগরণের স্পৃহা আসিল, তখন তাহার ছন্দও অন্য প্রকার হয়। পুনরায় সেই জাতির যখন ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য হয়, ভোগেচ্ছা প্রবল হয়, সমৃদ্ধি বিকাশ করিবার প্রয়াস মুখ্য হইয়া উঠে, তখন জাতির মনোভাব প্রকাশ করিবার ছন্দও নূতন প্রকারের হয়। জাতির মনের গতি কোন্ দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল তাহা একান্তভাবে জানিতে হইলে তাহার ভাষা, ছন্দ, যতি, মাত্রা প্রভৃতি বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে হয়। ইহা হইতেই জাতির মনোভাব, প্রগতি, অভ্যুত্থান, স্থিতি ও পতন নির্ণয় করা যাইতে পারে। জাতির ভিতর গম্ভীর ভাব আছে কি চপল ভাব আছে, মুমূর্ষু ভাব আছে কি প্রদীপ্ত ভাব আছে, হতাশ ভাব আছে কি বীর ভাব আছে, এইরূপ নানাবিধ মনোবৃত্তি ছন্দ আলোচনা করিলে বুঝিতে

পারা যায়। বিভিন্ন সময়কার ছন্দ বিভিন্ন প্রকার হয় এবং যতি, মাত্রা ও শব্দ-বিন্যাসও তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ছন্দ, যতি, মাত্রা ও তদনুযায়ী শব্দ ও অলঙ্কার বিশেষ পাঠ্য বিষয়। ইহারা জাতির আভ্যন্তরিক ভাব সকল, অতি নিভৃত ভাব সকল, অলক্ষিতে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার বিভিন্ন কালের ছন্দ লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জাতির মনোবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা তৎসময়ে কিরূপ প্রকৃতির ছিল। সেই সমস্ত ছন্দ হইতে জানিতে পারা যায় যে কোন্ ছন্দ জাতির ভিতর হতাশ বা বিষাদ ভাব আনিয়াছে, কোন্ ছন্দ ভক্তি-ভাব আনিয়াছে, কোন্ ছন্দ সামরিক ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতেছে, কোন্ ছন্দই বা জাতিকে প্রদীপ্ত ও অগ্রগামী করিয়া দিতেছে। জাতির পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের প্রচেষ্টা, জাতির গন্তব্য ও উদ্দেশ্য ছন্দ দিয়া প্রকাশ করিতে হয়। সেইজন্য ভাষার ভিতর ছন্দ, যতি, মাত্রা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বাঙ্গালা ভাষায় বহু প্রকার ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ প্রচলিত ছিল। ইহা ব্যতীত বৈষ্ণবগ্রন্থে অর্থাৎ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, প্রভৃতির রচনাতে বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ পরিলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের মালিনীর ছন্দ, এবং অন্যান্য বহু প্রকার ছন্দ যতি, মাত্রা বাঙ্গালা ভাষায় ছিল। অনুপ্রাস (Alliteration) বা এক শব্দের বিভিন্ন অর্থ—যাহাকে ইংরাজীতে Pun বলে—বিশেষ প্রচলিত ছিল। তৎকালীন শোক, বিষাদ, হতাশ, নিরাশ ভাব সকল প্রকাশ করাকেই ভক্তি ও নির্ভরের আদর্শ বলা হইত। হতাশ ও নিরাশ হওয়াই যেন ভক্তির একটি অঙ্গ

এবং দাস ও দাসের দাস হওয়াই বাঞ্ছনীয় ও গন্তব্য স্থান। ভাষা তখন ঠিক এই অবস্থায় ছিল।

ইংরাজী-শিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী এই "হতাশ ভাবের" বিরুদ্ধে প্রথম দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; এই বিবর্ত্তনকালে প্রত্যেকেই নিজ শক্তি-অনুযায়ী ভাষার ভিতর নূতন ভাব, নূতন ছন্দ, নূতন যতি-মাত্রা, ও নূতন শব্দ প্রচলন করিলেন। তাঁহারা এমন ভাবে ভাষাকে গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন যদ্দারা জাতির ভিতর মহতী শক্তি, উত্তেজক ভাব, সামরিক ভাব ও বিশ্বজয়ী ভাব প্রদীপ্ত হইতে পারে। প্রত্যেক মনীষীই তখন নিজ নিজ পন্থা অবলম্বন করিলেন। মহাপ্রতিভাসম্পন্ন মনীষী মাইকেল মধুসূদন দত্ত (যদিও প্রথমাবস্থায় প্রাচীন ভাব ও ছন্দ রাখিয়াছিলেন তথাপি) "মেঘনাদ বধ"-কাব্যে সম্পূর্ণ নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার এই নূতন ছন্দ, এই প্রশংসনীয় উদ্যম, বাঙ্গালা ভাষায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি ইহা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়াছেন। পয়ার ছন্দ হইল চৌদ্দ অক্ষর লইয়া। মাইকেল মধুসূদনের ছন্দও চৌদ্দ অক্ষরের; ইহা আট ও ছয় অক্ষরে ভাগ হইয়াছে এবং পংক্তি বা চরণ কখন বা প্রধাবিত অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষরেই ভাব প্রকাশ পাইল, কখন-বা পরবর্ত্তী পংক্তির আরো চার অক্ষর লইয়া ষোল অক্ষরে পরিপূর্ণ হইল, এবং অপর চরণটি দশ অক্ষরে হইল। ইংরাজী সাহিত্যে ইহাকে Stopped Verse, Run-on Verse ও Even Verse বলিয়া থাকে। সেক্সপীয়র

ও মিল্টনের কাব্যে এইরূপ ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বহুল পরিমাণে মিল্টনের ছন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অনেক স্থলে প্রধাবিত ও Stopped Verse বা খণ্ডিত ছন্দ হইয়াছে। এই ছন্দ পড়িতে অনেকেরই কষ্ট হইয়াছিল, সেইজন্য সাধারণ ব্যক্তিরা তখন ইহার তত আদর করিল না।

গিরিশচন্দ্রের ছন্দ তাঁহার নিজের সৃষ্টি, তিনি স্বয়ং ইহার বিকাশক ছিলেন। ইহা সেক্সপীয়র বা মিল্টনের ছন্দ নহে, মাইকেল বা অনুষ্টুপ্ ছন্দও নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব সম্পদ্। যতি-মাত্রা রাখিয়া পংক্তি ও ছত্রের শব্দ উচ্চারণ করাই হইল ইহার প্রধান লক্ষ্য। ইহাতে বাক্যের আড়ম্বর নাই কিন্তু যতি-মাত্রা দিয়া পাঠ করিলে ইহা অতীব শ্রুতিমধুর হয় এবং ইহা দ্বারা সহজেই মনোভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহা আকাশের ন্যায় মুক্ত, কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই, কিন্তু ইহার ভিতর এমন সুনিয়ম আছে যে, সহজেই চন্দে আনা যায়। যতি-মাত্রার যে কিরূপ উৎকর্ষ, এই ছন্দে তাহা স্পষ্টই পাওয়া যায়। ইহা বিশেষ তেজঃপূর্ণ ও ভাবপূর্ণ চন্দ। পাঠকালে পূর্ণমাত্রায় শ্বাস (Full-breath) গ্রহণ করিয়া যতি-মাত্রা রাখিয়া পংক্তি ও শব্দের উচ্চারণ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

গিরিশচন্দ্র প্রাচীন চৌদ্দ অক্ষরের নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া যতি-মাত্রার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। অক্ষরের গুণ্তি দিয়া সীমাবদ্ধ ছন্দ তিনি পছন্দ করিলেন না। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই যেমন তিনি স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক কর্ম্মী ছিলেন তেমনি আত্মবিকাশ তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইহাই তাঁহার ধাতুগত ও মজ্জাগত ভাব। ছন্দেও তিনি পরমুখাপেক্ষী বা

সংযতভাবে থাকিবার ব্যক্তি ছিলেন না, সেইজন্য তিনি ছন্দ পর্য্যন্তও আমূল পরিবর্ত্তন করিলেন—কোন বৈদেশিক বা অন্য কাহারও ছন্দ অনুকরণ না করিয়া নিজের প্রতিভাবলে নূতন প্রকার ছন্দ সৃষ্টি করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় অনেক প্রকার ছন্দ ছিল। তাহার কয়েকটি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

প্রচলিত কবিতা ছিল পয়ারের ছন্দে, যাহাকে অপর ভাষায় পাঁচালীর ছন্দ বলে। এই ছন্দে শেষ অক্ষরে মিল থাকিবে। প্রত্যেক পংক্তিতে চতুর্দ্দশ অক্ষর, এবং উহা আট ও ছয় অক্ষরে বিভক্ত। আট অক্ষরের মাথায় যতি পড়িবে।

লঘু-ত্রিপদী অপর এক প্রকার ছন্দ। ইহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি ছয় অক্ষরে হইবে এবং তৃতীয় পংক্তি আট অক্ষরে। দীর্ঘ-ত্রিপদীতে প্রথম দুই চরণ আট অক্ষরে এবং তৃতীয় পংক্তি দশ অক্ষরে।

মাইকেল "মেঘনাদ বধ"-কাব্যে পংক্তিতে চৌদ্দ অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহা আট ও ছয় অক্ষরে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পংক্তির শেষে মিল ছিল না। বিশেষত্ব হইল, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পংক্তির মধ্যে ছেদ পড়িত। কিন্তু সমগ্র পংক্তিতে চৌদ্দ অক্ষর থাকিত। ইহা Milton-এর Paradise Lost কাব্যের অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় যে কত প্রকার ছন্দ, যতি ও মাত্রা প্রচলিত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কারণ প্রগতিশীল ভাষায় বহু নূতন প্রকার ছন্দ প্রচলিত হওয়া উচিত।

এক নিয়মের যতি-মাত্রা পুনঃপুনঃ আসার নাম ছন্দ। সাধারণতঃ কয়েকটি প্রচলিত ছন্দ আছে, কিন্তু কবি ইচ্ছা

করিলে সেই ছন্দ পরিবর্ত্তন ও নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিতে পারেন। সাধারণ ব্যক্তির নিয়ম হইল যে, সে প্রচলিত বস্তু পছন্দ করে, পরিবর্ত্তনের বিশেষ পক্ষপাতী হয় না; সেইজন্য প্রচলিত ছন্দই জনসাধারণ পছন্দ করিয়া থাকে। ধীশক্তি-সম্পন্ন প্রতিভাবান্ কবি নিজের ইচ্ছানুযায়ী যতি-মাত্রা ঠিক রাখিয়া ছন্দ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। এইজন্য প্রত্যেক বিখ্যাত কবির নামে এক একটি করিয়া ছন্দ প্রচলিত আছে।

কাব্য-জগৎ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছন্দের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বহু কবি ভাবকে সঙ্কুচিত করিতেছেন। অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, ভাবকে যদি আর স্বল্প প্রসারণ করা হইত, তাহা হইলে পরিপূর্ণভাবে উহা পরিস্ফুট হইত, কিন্তু ছন্দের মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া ভাবকে কুণ্ঠিত করা হইয়াছে। অনেক কবির কাব্যের ভিতর এই দূষণীয় রীতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের লেখনীর ভিতর এই দূষণীয় রীতি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তিনি স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে ভাব-সম্পদ্‌ই মুখ্য, ছন্দ গৌণ মাত্র। ভাবধারা যেমন উত্তাল তরঙ্গরাশি তুলিয়া লহরী ও হিল্লোল সহ প্রধাবিত হইতেছে, কণ্ঠস্বরও তদ্রূপ উচ্চ-নীচ, দ্রুত-শ্লথ গতিতে নানা ভাবে চলিতেছে। শব্দ সংযোজনাও ঠিক অনুরূপ হইতেছে। এই ভাব-লহরী, কণ্ঠস্বর যেরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার যতি মাত্রাও ঠিক তদনুরূপ চলিতেছে। তিনি চার চরণ পরিমিত অক্ষর ও প্রচলিত যতি-মাত্রা কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। ভাবকে মুখ্য করিলেন, ছন্দ তাহার অনুবর্ত্তী হইল। ইহা তাঁহার

স্বষ্ট নিজস্ব ছন্দ। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বিল্বমঙ্গল (স্বগত)

"এই পরিণাম!
এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় শৃগাল কুক্কুর,
কিম্বা
চিতাভস্ম পবনে উড়ায়।
এই নারী—এরও এই পরিণাম!"

কিংবা—(স্বগত)

"ভেবে দেখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন!
ছিলি ব্রাহ্মণকুমার—
বেশ্যা দাস নয়নের অনুরোধে।—
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,—
ঘোর নিশা, মহাঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ;
র'হল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে!
সর্পে রজ্জুভ্রম—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন!
পুরস্কার—
বারাঙ্গনা তিরস্কার।"

"বুদ্ধদেব-চরিত" নাটকে সিদ্ধার্থ বলিতেছেন,—

(স্বগত)

"ক্ষণস্থায়ী দ্বিদল জীবন,
অর্দ্ধ-সচেতন—অর্দ্ধ-অচেতন
কেবা জানে কিবা ভাব ?
এই রামাদলে কুতূহলে
নাচিল গাইল,
নানা বেশে আবেশে অবশ তনু,
হাবভাব দেখাইল কত ;
পুনঃ কি বিকৃত ভাব !
সংজ্ঞাহীন—নাহিক উৎসব,
শবসম নিপতিত !
কেবা জানে কে পুনঃ উঠিবে—
কিংবা
মহানিদ্রাঘোরে অচেতন রবে,
কভু না জাগিবে আর !
নহে কিছু বিচিত্র জগতে !
এই শশী—নীলাম্বরে বসি,
ঢালিছে কিরণ রাশি হাসায়ে মেদিনী ;
কেবা জানে,
ঘোর ঘন-ঘটা কখন্ উদিবে—
ঢাকিবে কৌমুদীমালা !
অনিয়ম—বিপরীত খেলা ;
মর্ম্ম কেহ নাহি বুঝে !
এই আছে—এই পুনঃ নাই,
হেন বস্তু চাই !
ধিক্—ধিক্ মানবের সংস্কার।" ইত্যাদি।

"বিল্বমঙ্গল" নাটকে পাগলিনী বলিতেছে—

"চিন্তামণি—কভু এলোকেশী—
উলঙ্গিনী ধনি,
বরাভয়করা ভক্ত-মনোহরা
শব 'পরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী,
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।
কভু রজত-ভূধর—
দিগম্বর জটাজুট শিরে,
নৃত্য করে ববম্ বলি' গালে।
কভু রাস-রসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা ;—
প্রেমে ঢলে, বনমালা গলে,
কাঁদে বামা—
'কোথা বনমালী' ব'লে।
একা সাজে পুরুষ-প্রকৃতি ;
বিপরীত রতি,—
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার,
নাহি আর কালের গমন ;
নাহি হিল্লোল-কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয় ;
নাহি—নাহি ফুরাইল বাক্ ,—
বর্ত্তমান বিরাজিত।"

এই কয়েকটি উদাহরণ মনোযোগ করিয়া পাঠ করিলে আমার উপরি-উক্ত মন্তব্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মাইকেল তাঁহার কাব্যে অনেক বিদেশীভাব স্বদেশী করিয়া দেখাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র কিন্তু তাহা আদৌ পছন্দ করিলেন না। তিনি পুরাতন স্বদেশী ভাব, স্বদেশীয় আচার-ব্যবহার বজায় রাখিলেন। কারণ, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়, সহসা পরিবর্ত্তন করিলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিবে; সেইজন্য তিনি প্রাচীন আচার-পদ্ধতি, রীতি-নীতি ঠিক রাখিলেন, কিন্তু মুমূর্ষু, বিষণ্ণ, হতাশ ভাব—যাহা জাতির মনকে গ্রাস করিতেছিল, পঙ্গু, নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্যম করিয়া দিয়াছিল তাহা—তিনি একেবারে মূল হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি পুরাতন আচার-পদ্ধতির ভিতর জীবন্ত প্রদীপ্ত ভাব আনয়ন করিলেন—পুরাতন বিষয়বস্তু পুনরায় নূতন ভাব ধারণ করিল। মাইকেলের কাব্যে যেমন একটি সজীব তেজঃপূর্ণ ভাব আছে, গিরিশচন্দ্রের কাব্যের ভিতরও ঠিক সেইরূপ গম্ভীর, স্থির, ধীর ও তেজঃপূর্ণ ভাব রহিয়াছে। সময়োপযোগী জাগ্রত ভাবরাশি তিনি মুক্ত-হস্তে জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। জাতি যতটুকু সহ্য করিতে পারিবে ততটুকু জীবন্ত ভাবসম্পদ্ তিনি দিয়াছিলেন। অধিক মাত্রা হইলে বিপর্য্যস্ত ভাব হইবে সেইজন্য নিক্তিতে মাপ করিয়া তিনি শব্দ ও ভাব প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাই হইল "গৈরিশ ছন্দ"। ইহাই হইল গিরিশচন্দ্রের কাব্য রচনার বিশিষ্ট রস-মাধুর্য্য।

এক্ষণে কাব্যের বিষয় কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। কাব্য-রচনার প্রণালী হইল, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা প্রণয়ন করিতে হয় এবং সেই সকল গল্প বা আখ্যায়িকা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বলিবে, সমস্ত বিষয়-বস্তুটির

মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ভাব থাকিবে। কাব্য নায়ক বা নায়িকাকে প্রধান চরিত্র করিয়া প্রণয়ন করা যাইতে পারে। একটি হইবে মুখ্য এবং অপরটি গৌণ। মুখ্যের সর্ব্বত্র প্রাধান্য থাকিবে এবং গৌণ-চরিত্র আবশ্যক-মত মুখ্য চরিত্রের সম্মুখীন হইবে। নায়কের বা নায়িকার প্রাধান্যের জন্য রস-সৃষ্টিতে কিছু প্রভেদ ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহাভারতে বেদব্যাস "নলোপাখ্যানে" দময়ন্তীর প্রাধান্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার "নল-দময়ন্তী" নাটকে নলরাজার প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। উভয় আখ্যায়িকাই সুন্দর হইয়াছে। সেইজন্য বলিতেছিলাম, প্রাধান্যের তারতম্যে রস-সৃষ্টির কিছু বিঘ্ন হয় না। আর একটি বিষয় এইস্থলে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। মহাকাব্যে স্থান, কাল, পরিচ্ছদ ও গৃহাদির অবস্থা বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হয়। দৃশ্য-কাব্যে সেই সকল অংশ অভিনয়-নির্দ্দেশ অংশে প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং চরিত্র-সকল সহসা দর্শকের সম্মুখীন হইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে। এই সময়ে কেবলমাত্র সময় (Time) ও কাল (Duration of the day and season of the year) উল্লিখিত হয়, স্থানেরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকে, কিন্তু চরিত্রের কত বয়স, যুবক কি বৃদ্ধ, কিরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, তাহাদের মুখভঙ্গী ও অঙ্গসঞ্চালন কিরূপ হইবে সেই সমস্ত বিষয় কিছু বলা হয় না।

প্রধান চরিত্র বা প্রধান কেন্দ্র তাহার ভাব বলিয়া যাইবে। পার্শ্ব-চরিত্র বা পার্শ্ব-মূর্ত্তি সেই সমস্ত ভাব কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরের অবস্থাতে আলোচনা করিবে। প্রত্যেক পার্শ্ব-চরিত্র স্বতন্ত্র এবং তাহার আখ্যায়িকাও স্বতন্ত্র। বহুবিধ পার্শ্ব-চরিত্র

প্রণয়ন করিতে হয়। নিজের পরিধির পার্শ্ব-চরিত্র বা পার্শ্ব-কেন্দ্র সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন ভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক পার্শ্ব-কেন্দ্র ও পার্শ্ব-চরিত্র বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু কখনও প্রধান কেন্দ্রের সমকক্ষ হয় না। এইরূপে নানা পার্শ্ব-চরিত্র দিয়া ক্রমশঃ নানারূপে ভাব পরিস্ফুট করিয়া অবশেষে বিপরীত চরিত্রে উপনীত হইতে হয়। বিপরীত চরিত্রগুলি সমস্ত ভাব পণ্ড করিবার চেষ্টা করিবে। ইহা কখন এক বা দুই হইতে পারে। ইংরাজী কাব্যে ইহাদিগকে Villain and Sub-villain বলিয়া থাকে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহারা 'জটিলা কুটিলা' নামে বিশেষ পরিচিত। ইহাদের কার্য্যই হইল সমস্ত ভাব পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করা। এই বিপরীত চরিত্র দেওয়ায় প্রধান চরিত্রের ভাবের উৎকর্ষ ও মাধুর্য্য বহুল পরিমাণে বিকাশ হইয়া থাকে। প্রধান চরিত্রের গম্ভীর শক্তিপূর্ণ গভীর উদ্দেশ্য এই বিপরীত চরিত্রগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে। তাহার পর অপর পার্শ্বচরিত্র দিয়া ধীরে ধীরে ভাব উন্নয়ন করিয়া প্রধান চরিত্রের সন্নিকটস্থ ভাবের অনুরূপ, সহায়ক ও স্ব-শ্রেণীর ভাবে উপনীত হইতে হয়।

সহজে বোধগম্য করিবার জন্য উদাহরণস্বরূপ বাঙ্গালা-দেশের ৺দুর্গা প্রতিমার মূর্ত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রধান কেন্দ্র দুর্গা মূর্ত্তির যে ভাব, মহিষাসুরের ভাব ঠিক তাহার বিপরীত, এবং পার্শ্ব-দেবতা দক্ষিণদিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিপরীত ভাবে আসিয়াছে। মহিষাসুরকে নিধন করিয়া বামদিকের পার্শ্ব-দেবতা দিয়া ধীরে

ধীরে ভাব উন্নয়ন করিয়া প্রধান মূর্ত্তির সন্নিকটস্থ ভাবের পার্শ্ব-দেবতাগুলিকে আনা হইয়াছে। শিল্পী দুর্গা প্রতিমাকে এইরূপে দর্শন করিয়া থাকে। ইহাকে পুঞ্জচিত্র বা পুঞ্জচরিত্র বলা হয়। এই পুঞ্জচিত্রে (Grouped pictures) প্রধান বিগ্রহের বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া পার্শ্বদেবতাদিগের গাত্রের বর্ণ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিপরীত মূর্ত্তিতে ঠিক বিপরীত বর্ণনা আসিয়াছে। তাহার পর গাত্রের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাম-পার্শ্বের পার্শ্ব-মূর্ত্তির শেষ বিগ্রহের বর্ণ প্রদর্শিত হয়। এই বর্ণ প্রধান মূর্ত্তির বর্ণের কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরের বর্ণ হইবে। ইহাই হইল বর্ণ-সংযোগের নিয়ম। অন্য একটি হইল মুখভঙ্গি ও মনোভাব। মনোভাব ও মুখভঙ্গিও ঠিক তদনুরূপ হইবে। চিত্রশিল্পে যেরূপ বর্ণ ও অবয়ব দিয়া প্রতীক পরিদর্শিত হয়, শব্দ, ভাব ও ভাষা দিয়া কাব্যও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উভয়কে এক শ্রেণীতে গণ্য করা যাইতে পারে। উভয়কেই ললিতকলা বা Muse বলা হয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু এই যে, পার্শ্ব-চরিত্র নিজের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব ভাব যেমন প্রথম অঙ্কে দেখাইয়াছে, তেমনি নানা স্থানে নানা সময়ে সেই চরিত্র সর্ব্বত্রই নিজের ব্যক্তিত্ব ও নিজের উপযুক্ত মনোভাব রাখিয়া যাইতেছে। কখন দেখিতে পাওয়া যাইবে না যে তাহারা অন্যান্য চরিত্রের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। নানা স্থানে নানান ব্যক্তির সহিত কথোপকথনকালে বেশ স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে এই ব্যক্তিকে পূর্ব্বে যেন কোথায় দেখিয়াছি! প্রত্যেক চরিত্রের স্বতন্ত্র ভাব অক্ষুণ্ণ রাখা, প্রাচীনকালে

কেবলমাত্র এক বেদব্যাসের অমর লেখনীপ্রসূত মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য লেখকের গ্রন্থে চরিত্র-সকল প্রায় অল্পবিস্তর মিশিয়া যাইতেছে, এইরূপ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অমর লেখনীতে এইরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই কারণ তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, গিরিশচন্দ্রের কাব্যের সার্থকতা কোথায়? কেনই বা গ্রন্থ-সকল এত হৃদয়স্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হইল। এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে একটি কথা বলা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের কাব্যে অধিষ্ঠান বা Pose অতীব সুন্দর এবং এক আশ্চর্য্য বস্তু। অলঙ্কার-শাস্ত্র দিয়া বিচার করিতে হইলে, এই অধিষ্ঠান বা দাঁড়া (Pose) কাব্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, Pose কাহাকে বলে?—Pose is the mental attitude of a person expressed through limbs. সেইজন্য চিত্রশিল্পী (Painter) বিনাক্লেশে সহজেই সেই সমস্ত চরিত্র পটে সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—

"চম্পক-কলি পড়ে ঢলি ঢলি"

অর্থাৎ অল্পবয়স্কা কন্যা ভাবাবেশে কিরূপ পদ বিক্ষেপ করিয়া চলিবে তাহাই স্পষ্ট দেখান হইল। "পড়ে ঢলি ঢলি" কথাটি গিরিশচন্দ্রের নিজের সৃষ্টি। ইহার অনুরূপ শব্দ ভাষায় পাওয়া যায় না যদ্দারা সঠিক মনোভাব প্রকাশ করিতে পারা যায়। আর একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—

"সদাই থাকে মন-বিভোরা"

অর্থাৎ অল্পবয়স্কা কন্যার মন যেমন সর্ব্বদাই অন্য চিন্তায় অভিভূত, আচ্ছন্ন ও বিভোর হইয়া থাকে, সেই মানসিক অবস্থা অল্প কথায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই শব্দ-দ্বারা বয়স, পদবিক্ষেপ, মুখভঙ্গি ও অঙ্গসঞ্চালন সকলি প্রকাশ পাইল। ভাবানুযায়ী শব্দ-সংযোগ করাতে গিরিশচন্দ্রের অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল। বিল্বমঙ্গল, চৈতন্য-লীলা, বুদ্ধদেব-চরিত, প্রফুল্ল, হারানিধি প্রভৃতি গ্রন্থে গিরিশচন্দ্র চরিত্র-সন্নিবেশ কালে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি এই সমস্ত নাটকে প্রধান চরিত্র, পার্শ্ব-চরিত্র ও বিপরীত চরিত্র প্রণয়ন করিয়া সমস্ত ভাবরাশি বিকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেন্দ্র-চরিত্র ও পার্শ্ব-চরিত্র যে যেমন কথাবার্ত্তা কহিতেছে তাহাতে মনস্তত্ত্বের ধারা ও পর্য্যায়ের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানানুযায়ী মনে যেরূপ নানা ভাব, বিপরীত ভাব ও বিভিন্ন ভাব উদয় হয়, দার্শনিক মতানুযায়ী গিরিশচন্দ্রের বর্ণিত চরিত্র সকল তদ্রূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, দার্শনিকের দৃষ্টিতে কোন বৈলক্ষণ্য বা ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক চরিত্র তর্ক-যুক্তি দিয়া নিজের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। প্রত্যেক পার্শ্ব-চরিত্র যেন এক একটি ক্ষুদ্র মনস্তত্ত্ববিদ্ ও নৈয়ায়িক। প্রত্যেক চরিত্রটি পূর্ণ ও স্বতন্ত্র, সংমিশ্রণ বা অর্দ্ধ-অবয়ব বা বিকলাঙ্গ নহে।

সামঞ্জস্য-ভাব বা Cadence গিরিশচন্দ্রের নাট্যকলার অতুলনীয় সম্পদ্। স্বতন্ত্র ভাবে কি করিয়া পরিমিত শব্দের দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতে হয়, তাহা গিরিশচন্দ্র পরিষ্কার-রূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন চরিত্রই অসমঞ্জস ও অপরিমিত ভাষা ব্যবহার করে নাই। প্রত্যেক চরিত্র

অপরাপর চরিত্রের মর্য্যাদা ও পরিমাণ বা প্রাপ্য-বিষয় রক্ষা করিয়া বাক্যালাপ করিতেছে। ইহাকে Cadence বা সামঞ্জস্য-ভাব বলিয়া থাকে। In cadence all the component parts must chime in unison to lead on to symphony—গিরিশচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থে ইহা সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কাব্য বা নাটক পাঠকালে অধিষ্ঠান (Pose) ও সামঞ্জস্য-ভাবের (Cadence) প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

গিরিশচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এত বিশাল ও প্রখর ছিল যে পাঠক বা শ্রোতার মনকে স্বল্প সময়ের ভিতর ভুলাইয়া দিয়া, বিমোহিত করিয়া, তাহাদের অজ্ঞাতসারে কেন্দ্র-চরিত্রের প্রতি লইয়া যাইত—কেন্দ্র-চরিত্রই তখন সকলের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইত। কথাপ্রসঙ্গে তিনি পার্শ্ব-চরিত্রের মুখ দিয়া এমন একটি প্রসঙ্গ, এমন একটি উদ্বোধক বা Suggestiveness প্রকাশ করাইতেন যাহাতে সকলে পূর্ব্বকথা ত্যাগ করিয়া কেন্দ্র-চরিত্রের বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত। এই Suggestiveness বা ব্যঞ্জনা গিরিশচন্দ্র অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। ইহা এমন অলক্ষিত ভাবে আছে এবং নিভৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে পাঠক বা শ্রোতা সাধারণতঃ তাহা ধরিতে পারে না। এক গল্প হইতে অপর গল্পে চলিয়া যাইতেছে এবং কেনইবা জানিতে ও শুনিতে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে তাহা অনেক সময় দর্শক বা পাঠক বুঝিতে পারে না। উদ্বোধকের বিশেষত্ব এই যে উহা মনকে অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতসারে অপর দিকে লইয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের কাব্য এই সকল লক্ষণ অনুসরণ করিয়া পাঠ করিলে গ্রন্থের সার্থকতা ও গূঢ় মর্ম্মের উপলব্ধি হয়।

পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়া আসিয়াছি যে, গিরিশচন্দ্রের ছোট ছোট চরিত্রগুলিও এক একটি নৈয়ায়িক। ইহার প্রধান কারণ হইল, গিরিশচন্দ্র স্বয়ংই একজন পরিপূর্ণ নৈয়ায়িক ছিলেন। যুক্তিপূর্ণ তর্ক, বিতর্ক কেমন করিয়া সঠিকভাবে করিতে হয়, তাহা তিনি "বুদ্ধদেব চরিতে" সিদ্ধার্থের মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ যুক্তিতর্কপূর্ণ উচ্চভাবোদ্দীপক কবিতা তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট করিবার জন্য নিম্নে এই উদাহরণটি প্রদান করিতেছি :—

সিদ্ধার্থ—

"করি পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা উপাসনা ;
কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী ?
জগন্মাতা—
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি।
দেখ, নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়—
যদি নৃপ, কৃপা নাহি কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?
নির্দ্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি,
কেন প্রাণীনাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি ?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন—
দুর্ব্বল এ ছাগপাল,

হায় ! হায় ! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়--
"প্রাণ যায়, রক্ষা কর নরনাথ।"
মহারাজ,
জীবগণ হিংসি পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে।
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন ?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে ;
প্রাণ দানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণ নাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে ;
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি।
মানবের প্রায়
অস্ত্রাঘাতে ব্যথালাগে গায়—
বেদনা জানাতে নারে।
বধি তারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন
না হয় কখন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হ'ন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম উপার্জ্জন,

করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক্ তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্রবিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ—
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ ;
বধ রাজা, আমার জীবন,
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণ দান।
নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে,
এড়াইবে জীব-হিংসা দায়।
আপন ইচ্ছায়
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ রাখ যোগীর মিনতি—
বসুমতী কলুষিত ক'রনা ভূপাল।—
স্বার্থহেতু
ক'রনা হে কোটি প্রাণী বধ।
কোথায় ঘাতক, রাজকার্য্যে বধ মোরে।"

এইরূপ যুক্তি-তর্কপূর্ণ ভাষণ তিনি সিদ্ধার্থের মুখ দিয়া অপর আর একস্থলেও প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :—

"কোথা ব্রহ্ম? কোথা তাঁর স্থান?
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার ;
তবে কেন রোগ শোক জরা ;
দুঃখের আগার ধরা?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম?
জীবকুল কিবা অপরাধী,

নিরবধি সহে দুঃখ ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কভু নাহি পারে !
এ সংসার সন্তাপ-সাগর,
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা,
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন ?
রোগ শোকে করে আর্ত্তনাদ,
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায় ?
কিংবা ব্রহ্ম,
শক্তিহীন দুঃখের মোচনে ?
*   *   *   *   *
সর্ব্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্,
দয়াবান কভু সে ত নয়।" ইত্যাদি।

এইস্থলে একটি বিষয় পাঠকবর্গকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, নৈয়ায়িক-চরিত্র-অঙ্কন ও দার্শনিক-চরিত্র-চিত্রণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়, কেহ যেন দুইটি বিষয়কে একত্র করিয়া বা মিশাইয়া না ফেলেন। উপরে আমি উদাহরণ-স্বরূপ মাত্র সামান্য কয়েকটি নৈয়ায়িক-চরিত্র-অঙ্কন দেখাইলাম। গিরিশচন্দ্রের দার্শনিক-চরিত্র-সৃষ্টি যে কত উচ্চস্তরের, তাহা পরে লিপিবদ্ধ করিব।

তৃতীয় বক্তৃতা

বিবর্ত্তন বা Transition গিরিশচন্দ্রের কাব্যে এক নূতনত্ব। কিরূপে মন পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিরূপে ধীরে ধীরে এক ভাব হইতে মনের গতি অন্যদিকে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা তিনি অতি সুন্দরভাবে গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। এই বিবর্ত্তন হইল গিরিশচন্দ্রের রচনার এক প্রধান গুণ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিবর্ত্তন অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অতি স্থূল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখনীর ভিতর প্রচুর পরিমাণে বিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। যথা—

"তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। ... ...
... ...
দূরে গেল জটাজুট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণরথে। কহিল সে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, সরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!"

মাইকেল ইহাতে দেহ পরিবর্ত্তন দেখাইলেন এবং বিবর্ত্তন অতি আকস্মিক হইয়াছে। মধুসূদনের বিবর্ত্তন যে অতি সুন্দর

সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বিবর্ত্তন ভিন্ন প্রকৃতির। এক্ষেত্রেও তিনি এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বকালীন কবিরা দৈহিক বিবর্ত্তন দেখাইতে পটু ছিলেন। গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বকালীন কবিদিগের প্রথা বা রীতি ত্যাগ করিয়া মনোবিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিলেন। মনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় এবং ধীরে ধীরে তাহা কিভাবে অন্য পথে চালিত হয় তাহাই তিনি কাব্যে সুচারু-রূপে দর্শাইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের এই মনোবিজ্ঞানের ধারার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের মনোবৃত্তির সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য এই স্থলে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কারণ স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, "মন করে শরীর সৃজন"।

বিষয়বস্তুটিকে সহজবোধ্য করিবার জন্য নিম্নে একটি উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। "চৈতন্যলীলা"য় জগাই-মাধাই নামে দুইটি মাতালের চরিত্র আছে। একস্থলে মাধাই জগাইকে বলিতেছে, "জগা, তুই নাচ্‌চিস্ কেন?"

জগাই—বৈরাগী হব। ব্যাটারা কিন্তু ভাই বেড়ে গায়, "হরি হে দেখা দাও।" মেধো! আমায় তেলক্ কেটে দিতে পারিস্? "প্রেমসে কহো ভগী ময়রাণী," "হরিহে দেখা দাও।"

মাধাই—আচ্ছা, "হরে" কেরে শালা, জগা, জানিস্? আমি হলে বল্‌তেম্, "ধরে লে আও শালাকো!" আমার বোধ হয়, এক শালা মালপোওয়ালা, ক্ষিদে পেলেই ডাকে। আচ্ছা জগা! তুই যে মালপো চুরি কর্‌তে গেলি, ভাবটা কি বুঝলি?

জগাই—চিল্লে ক্ষিদে বাগিয়ে নেয়। তুই দেখলি তো চারখানা খেতেই কুপোকাৎ! রাধা বলে, আর এক এক ব্যাটা বিশ খানা উড়ায়।

মাধাই—এক শালাকে এক দিনতো বাগে পেলুম না।

জগাই—তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস্।

মাধাই—দেখ্, মাতাল বলিস্ তো ভাল হবে না। কোন দিন মাতাল দেখেছিস্? তুই যেমন ছটাকে—আমি দু'সের খেয়ে, সানসা আছি। এখন চলেছিস্ কোথায়?

জগাই—চল্‌না, কেত্তন শোনা যাক্‌গে। ব্যাটারা বেড়ে বাজায়, "চাকুম চুকুম ভুশ্ ভুশ্ ভুশ্।"

মাধাই—তুই বড় গান শোন্‌নেওয়ালা!

জগাই—ওরে, বেশ এক রকম রাধে রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপ্‌তিনীকে মনে পড়ে।

মাধাই—তুই দেখছি বৈরাগী হবি।

জগাই—তোর চৌদ্দ দুগুনে বাহান্ন পুরুষ বৈরাগী হোক্!

মাধাই—ভেয়ের চৌদ্দপুরুষ তোলে রে শালা?

জগাই—নে, রাগ করিস্ নি, মিষ্টি করে বল্‌লুম—
মদ দেবো তোর গাল ভরে,
আয় ছুটে আয় হাঁ ক'রে।

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাতে জগাই-মাধাই নিমাইয়ের নিকট বলে, "আমার অন্তরে আগুন জ্বল্‌ছে। প্রভু, আমি জানি আমি অজ্ঞান, আমায় পরিত্রাণ কর" ইত্যাদি। উপরোক্ত জগাই-মাধাই-এর কথোপকথন বিশ্লেষণ করিলে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা দুর্ব্বৃত্ত ও মাতাল। ভাষায় ও জিহ্বায় মাতালের শব্দ রহিয়াছে, কিন্তু মনের ভিতর নানাবিধ

ভাব-তরঙ্গ আসিয়া উদ্বেলিত করিয়া তাহাদিগকে অন্য পথে লইয়া যাইতেছে—পূর্ব্ব-অভ্যাস-জনিত মাতালের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কিন্তু অন্তরে বিপ্লব উপস্থিত। একদিক দিয়া পাঠ করিলে দেখা যায় যে, মাতাল, মাতলামির কথাবার্ত্তা কহিতেছে; অন্যদিক বা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেন তাদের অন্তরের গভীরতম স্থল হইতে অস্পষ্ট ভাষায় ধ্বনি উঠিতেছে, "আমি তেলক্ কেটে রাধা রাধা ব'লে খোল বাজিয়ে বৈষ্ণব বেশে প্রেমে বিভোর হ'য়ে রাধা নাম কর্‌ব।" দুরাচার মাতালকে কিরূপে প্রণম্য সাধু করা যায়, গিরিশচন্দ্র (সেই বিবর্ত্তন) জগাই-মাধাই রূপ চরিত্রের ভিতর দিয়া অতি মনোরমভাবে দেখাইয়াছেন। বাহ্যিক শব্দ দ্বারা এক অর্থ দুইভাবে নির্ণয় হয়, মনস্তত্ত্ব দিয়া অনুধাবন করিলে অন্য অর্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এক সঙ্গেই দুই অর্থ দুইভাবে দেখাইয়াছেন। দার্শনিক কবি ব্যতীত এরূপ মধুর চরিত্র-চিত্রণ কেহ করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র যে কত উচ্চমার্গের দার্শনিক কবি ছিলেন, ইহাই তাহার একটি প্রকৃষ্ট পরিচয়।

আর একটি বিবর্ত্তনের উদাহরণ প্রদান করিতেছি। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপিয়র একজন সুদক্ষ যশস্বী নাট্যকার। "ম্যাক্‌বেথ" তাঁহার একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অনুবাদ করিয়া বিপুল সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। "ম্যাক্‌বেথ" নাটকের প্রথম অঙ্কে, তৃতীয় দৃশ্যে ম্যাক্‌বেথ প্রথমেই বলিলেন—

So foul and fair a day I have not seen.

গিরিশচন্দ্র ইহার অনুবাদ করিলেন,—

ম্যাক্‌বেথ—(এই ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিল অবনী—
তখনি অমনি দিনমণি
প্রকাশিল হেম-কর।)
দুর্দ্দিন সুদিন হেন হেরিনি কখন।

অনুবাদের ভিতরও তিনি কেমন সুন্দর মনোমুগ্ধকর বিবর্ত্তন অঙ্কন করিয়াছেন!

গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থ অনুশীলন করিতে হইলে এবং তাঁহার রচনার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে হইলে তাঁহার সৃষ্ট অলঙ্কারের বিষয় কিছু জানা আবশ্যক—কারণ, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি ভারতীয় পুরাতন অলঙ্কার বিশেষ ব্যবহার করেন নাই; ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াও তাহাদের অলঙ্কার তিনি তাঁহার কাব্যে তদ্রূপ প্রয়োগ করেন নাই; নিজের ভাবানুযায়ী তিনি স্বতন্ত্রভাবে অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ সংক্ষেপে নিম্নে কয়েকটি অলঙ্কার প্রদত্ত হইল। যথা—

আরোপিত গুণ—

গোধন ফিরে, ধীরে ধীরে ধীরে,
গগনে ছাইল বেণু।
(হাম্বা হাম্বা হাম্বা রবে)
ডুবিল রবি, রক্তিম ছবি,
বাজিল মোহন বেণু॥
আকুল বেণী, ধাইল রাণী,
ঘন শ্বাস বহে তাহে।

(হারানিধি)

উন্মনা ভাব—

বিল্বমঙ্গল—যাচ্ছি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ মেড়াটাকে দুটী দানা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর শিং ঘষে ত বারণ ক'র না। আমি চল্লুম। (বিল্বমঙ্গল)

শ্লেষপূর্ণ কথা—

দ্রৌপদী—ধিক্ ধিক্ ধর্ম্মনিষ্ঠা তার—
ধিক্ দয়া!
ধিক্ ধিক্ বীরাঙ্গনা বলি মনে করি অভিমান।
এমন বেদনা,
তপাচারী যুধিষ্ঠির কি বুঝিবে?
ভীম বিনা কারে জানাইব ব্যথা?
তিন দিন যদি বয়ে যায়,
কীচক না হারায় পরাণ,
ভগবান, আত্মহত্যা না ডরিব—
পাশরিব দুঃশাসনে—
বেণী না বাঁধিয়া
জলে তনু দিব বিসর্জ্জন।
নিদ্রিত কি শুইয়াছ মহানিদ্রা কোলে—
উঠ উঠ সূপকার!

ভীম—কহ কহ সহদেব,
অজ্ঞাত হইল অবসান?
একি?—যাজ্ঞসেনী!
গভীর রজনী, ডরি পাছে কেহ দেখে।

দ্রৌপদী—কুলটায়—
পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ;

সূতপুত্র প্রহারিল পায়—
হেন কুলটায় নাহি স্পর্শে অপমান।

ভীম—কৃষ্ণা কৃষ্ণা, হুতাশনে ঘৃত নাহি ঢাল—
বহু কষ্টে ধর্ম্মরাজে চাহি ধরি দেহ।

দ্রৌপদী—মরিবে,—মরণে প্রস্তুত আমি।
অজ্ঞাতে পাণ্ডব নাম হোক অবসান—
অপমান গোপনে রহিবে।
মুক্তভাবে কহি,
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রহুক কুশলে।

(পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)

প্ররোচনা—

গুঞ্জমালা—চণ্ড অতি মহৎ সুজন, চণ্ড অতি
আত্মত্যাগী,—না না? কহ কিবা প্রজাগণে?
বড় ধীর, বড় শান্ত, বড় উচ্চাশয়,
করুণাসাগর!—একি, কেহ নাহি কহ
কোন কথা? হের বিগুমান পানপাত্র—
মুকুলের পানপাত্র—এতে হলাহল
কে দেছে? বিচার কর, রাজমাতা আমি,
বিচার প্রার্থনা করি, বল সবে এক-
বাক্যে, আমি নিতান্ত কলহপ্রিয়, বল—
বল; কেবা আছ প্রজা-মাঝে—আমি নীচ,
আমি হীন! জান কি সকলে বন্যবাজী
বিবরণ, আসিয়াছে তুরঙ্গ সুন্দর,
পৃষ্ঠে লয় যারে তার জীবন সংশয়!
সেই ঘোড়া—চণ্ড মহাশয়, যার গুণ-
গান রাজ্যময়, এনেছেন মুকুলের তরে

মহাসমাদরে, আদর না ধরে আর,—
বিমাতার পুত্রের কারণ আয়োজন
হয়, জান বা না জান সমুদয়, শোন
পরিচয়, মৃগয়ায় মুকুল যাইবে—
চণ্ড মহামতি—রাণা প্রতি ভক্তি অতি,
আপনি যাবেন সাথে, পরে মৃগয়ায়
কেবা কোথা যায়, কেবা তার দায়ী বল ?
মুকুল বিহনে রাজসিংহাসন শূন্য
নাহি রবে, আছে রাণা লাক্ষ-সুত চণ্ড,
গৌরবে বরিবে শিশোদীয়া কুলমান
করিতে উজ্জ্বল। সবে কর সুবিচার,
নহি অন্য অপরাধী, পুত্রের কল্যাণ
কামনা নিয়ত মম ; নারী হীনজ্ঞান,—
কে দোষী নির্দোষী শীঘ্র কহ প্রজাগণে—
দোষী হই, দণ্ড মোরে দেহ এই ক্ষণে। (চণ্ড)

উত্তেজিত করা—

চণ্ড—এই দেখ ভগ্নসৈন্য দলবদ্ধ পুনঃ
আক্রমিছে নেহার চিতোর সেনাগণে,—
দেহ রণ, বীরদর্পে কর আক্রমণ,—
ছিন্নভিন্ন হইবে এখনি, বৃক্ষপত্র
যথা ঘূর্ণবায়ে ; বজ্রসম পড় শত্রু
মাঝে, স্বল্প শ্রম, প্রতিজনে শত দস্যু
বধিতে হইবে, শত দস্যু মাত্র এক
বীরের বিরোধী। স্রোতে তৃণ রহে কত
ক্ষণ ? কর আক্রমণ—কর আক্রমণ,
সিংহের বিক্রম শিবা সয় কতক্ষণ ! (চণ্ড)

সরল ভাব—

উত্তরা—কহ বৃহন্নলা, শুনি তব দুঃখ কথা।
আহা কত ব্যথা পেয়েছ গো তুমি—
আছে কি গো সহোদর সহোদরা ?
অর্জ্জুন—বৎসে, তব সঙ্গীতে আলস্য বড়।
উত্তরা—তিরস্কার নাহি কর বৃহন্নলা,
অভ্যাস করেছি গান,
শুন বৃহন্নলা, স্বপনে তোমারে হেরি—
যেন তব কন্যাসনে খেলি,
প্রীতিভরে হের দাঁড়াইয়া দূরে।

(পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)

অনুনয়--

সিদ্ধার্থ—করি পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা উপাসনা ;
কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী ?
জগন্মাতা,
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি।
দেখ নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়।
যদি নৃপ, কৃপা নাহি কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?

(বুদ্ধদেব চরিত)

হতাশ ভাব—

যোগেশ—মচ্ছো, রাস্তায় মত্তে এসেছ ? তোমাদের এতদুর হয়েছে ?
আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। যেদোও মরেছে ?
বেশ হয়েছে ! মচ্ছো, মর ; আমি মদ খাইগে। ঘরে

মত্তে পাল্লে না? তা মর, রাস্তায়ই মর; কি করবো, হাত নেই, মদ খাইগে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! (প্রফুল্ল)

গুপ্তপ্রেম—

থাক—(স্বগত) একেই বলি টান; একেই বলি মনের মানুষ! নইলে, হৃদে পোড়ারমুখো? খেংরা মারি, খেংরা মারি!

দোমনা ভাব—

সাধক—ত্যাখ থাক, প্রেমের কথা যদি কেউ অনুধাবন কর্ত্তে পারে, সে কেবল তোমায় আমি দেখ্‌ছি। একি যে-সে প্রেম—রাধাকৃষ্ণের প্রেম।

থাক—আমি প্রেমের কি জানি বল, তবে এই জানি যে, মনের মানুষ পেলুম না!

সাধক—মনের মানুষ কি পাবে? করে নিতে হবে। মানুষ সবই মনের মতন; বলছে "পুরুষ—পরেশ"। তবে গোপন রাখা চাই। প্রেমের খেলা ত্যাখ—রাধিকা মামী, কৃষ্ণ ভাগিনা, রাসলীলা তাই অত গোপন। তুমি যে বড় ব্যস্ত রয়েছ, নৈলে প্রেমের কথা আরো দুটো শোনাতুম। আমার মনের বড় সাধ, তোমায় অসৎ পথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসি। ইত্যাদি—

মর্ম্মস্পর্শী বেদনা—

চিন্তামণি—থাকি, সে আর আস্‌বে না। থাকি, তুই তাকে চিনিস্‌নি—সে আমা ভিন্ন জান্‌ত না, সে যখন আমায় না দেখে তিন দিন আছে, সে ফাঁকি দে চ'লে গেছে। আহা, সে আমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়েছিল, শেষটা আমি তারে দেশত্যাগী কল্লুম। (বিল্বমঙ্গল)

আত্মগোপন—

বৃহন্নলা—কত কহ পাঞ্চালী আমায় ?
হের দীর্ঘ বেণী, শঙ্খের বলয়,
আমি ধনঞ্জয় কি হেতু প্রত্যয় কর ?
রাজ্যে রণ, নারীগণ মাঝে।
কহ, ধর্ম্মরাজে লজ্ঘিব কেমনে ? ইত্যাদি—
(পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

হীন ভাব—

দোকড়ি—আপনারগ মত লোক পালিতো সে বাঁচি যায়, যত জুটছে আটকুটে বরাখুরে, বুড়া মরছে, আমি তো একবারেই চল্‌ছি সেহানে ; আসেন, এহনি পরিচয় করিয়ে দেব, কিন্তু আখেরে মোরে পায়ে ঠেল্‌বেন না। ইত্যাদি—
(বেল্লিক বাজার)

প্রোৎসাহিত করা—

নসীরাম—কাকি, ঘোড়া চড়াবাই তো, বীরাঙ্গনার কাজই এই ; আমি আর কারুর কথা শুন্‌বো না, আমার দম্ ফেটে যাচ্ছে, আমি স্পীচ্ আরম্ভ করি। লেডিস এণ্ড জেণ্টেলম্যান্, "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত কভু জাগেনা জাগেনা।"

১ম সংস্কারক—প্রেমের কোহেল হে দয়াময় ডাহো
হৃদয় বসন্তে।

২য় সংস্কারক—Oh! Poor India, where art thou,
Come to your own country.
(বেল্লিক বাজার)

বহুভাব-সমাবেশ—

হৈ হৈ, রৈ রৈ পূর্ব্বস্মৃতি জাগে।

অলৌকিক ভাব—

"নিষ্প্রভ-আলোক (Lurid) জলে ভৈরবের ভালে।"
"আভাহীন বহ্নি জলে ঈশানের ভালে।"

(জনা)

মিলটন তাঁহার কাব্যে Lurid Light বলিয়া একটি ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাহারই বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন "নিষ্প্রভ-আলোক"।

বিস্ময় ভাব—

চিন্তামণি—তুমি কি উন্মাদ ?

বিল্বমঙ্গল—যদি আজও না বুঝে থাক, তুমি প্রেমিকা নও, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর। ... ... সত্য চিন্তামণি, আমি উন্মাদ ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর !

(বিল্বমঙ্গল)

এইস্থলে আমি একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। সে বহুদিন পূর্ব্বের কথা, আমরা সকলে গিরিশচন্দ্রের গৃহে বসিয়া নানাবিধ সদালাপ করিতেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং "তুমি বড় সুন্দর" এই কথাটি তিনবার উচ্চারণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। সে দৃশ্য যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। বিশেষত্ব হইতেছে যে, প্রতিবার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গী নূতন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। বিল্বমঙ্গলের এই সামান্য কয়েকটী কথা বিস্ময় ভাবের সহিত উচ্চারণ করা অত্যন্ত দুরূহ ; কারণ ইহার পর হইতে বিল্বমঙ্গল নূতন পথের পথিক হইলেন।

আশ্চর্য্য ভাব—

চিন্তামণি—উঃ ! এখনও নদী যেন রণমুখী ; নদী চারপো হয়েছে ।
ঝাঁপ দিতে সাহস হল ? কৈ, কাঠ কৈ ?

(বিল্বমঙ্গল)

বিরাট ভাব—

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে.
বব বম্ বব বম্ গালে বাজে ।
রজত ভূধর নিন্দি কলেবর,
শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে ॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণি ফণ্ণ ফণা, জাহ্নবী কল কল
জটা জলদজাল মাঝে ॥ (দক্ষযজ্ঞ)

এই সঙ্গীতটি স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী প্রায়ই এইটি গান করিতেন। স্বামীজী বলিতেন, "দেখ্‌চিস্ জি. সি. কি বিরাট ভাব এই গানটির ভিতর প্রকাশ করেছে।"

দার্শনিক ভাব—

শঙ্কর—এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে যায় দিন,
ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে খেলে মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান মহা-অন্ধকারে,
ঘোরে ফেরে জন্ম-মৃত্যু-ঘূর্ণিপাক্ মাঝে ।
ভ্রম-বলে রহে ভুলে, কল্যাণ না চায়,
বার বার ঠেকে, পুনঃ পুনঃ দেখে,
শিখেও না শিখে হায় !
মহাভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে,
জেনে শুনে আছে বদ্ধ আপন পাশরি । (শঙ্করাচার্য্য)

দ্বিত্ব ভাব—

সিদ্ধার্থ—(স্বগত) ক্ষণস্থায়ী দ্বিদল জীবন,
অর্দ্ধ সচেতন—অর্দ্ধ অচেতন—
কেবা জানে কিবা ভাব ? ইত্যাদি—
(বুদ্ধদেব চরিত)

প্রবীর—ফাল্গুনী সমর-ক্লান্ত সম্ভব না হয় । (জনা)

প্রলয় ভাব—

জনা—দূরে—দূরে—
দিক্-অন্তে নিশার আলয় যথা ।
যথা একাকার—প্রলয়-হুঙ্কার
উঠিতেছে রহি রহি,
নাহি যথা সৃষ্টির অঙ্কুর,
দৃষ্টিহীন দিবাকর ।
যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান ।
যথা জড় জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত,
ঘোর ধূম-মাঝে
চলে প্রলয় জীমূত-শ্রেণী
বজ্র-অগ্নিধারা ঝরে ।
যথা ঘোর হাহাকার, পিনাক টঙ্কার ।
করি স্থান পান,
শূল করে মহারুদ্র ধায় ।
যথা,
আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশানের ভালে,
প্রলয়-বিষাণ নাদে ।
দূরে—দূরে—চল ত্বরা পুত্র-শোকাতুরা । (জনা)

বিরহ ভাব—

শ্রীবৎস—আহা আহা প্রাণেশ্বরী কোথা গেলে ?
কে দুর্জ্জন করিল হরণ
আমার জীবন-ধন ?
শূন্য প্রাণ, শূন্য এ জীবন,
শূন্য এই দেহ, প্রেয়সী বিহনে ধরি
সাগর-বাহিনি, বল তরঙ্গিণি,
মম প্রণয়িণী গেছে কতদূরে ?
জীবন-আধার প্রেয়সী আমার,
বল তার কোথা দেখা পাব ?
কোথা যাব,
তারে ছেড়ে কেমনে রহিব ?
শত্রুপুরে স্মরিয়ে আমারে,
কত কাঁদে বামা !
অন্তর বিকল,
ব'লে দেহ কোথা গেলে পাব প্রেয়সীরে ?
অকূল-পাথারে দেহ কূল ভগবান।
ওহে জগৎ-জীবন,
আশুগতি সমীরণ,
মম প্রাণধন কোথা আছে
বল মোর কাছে।
ব্যোমচর, যে জান বল না,
প্রাণের ললনা,
ছেড়ে গেছে, কোথা আছে অভাগিনী।
মরি, প্রাণে মরি
বার্ত্তা দেহ কেহ কৃপা করি
প্রাণেশ্বরী কোথা মোর ভাসে।

শত্রু-বাসে কাঁদে সে হুতাশে,
শান্ত হবে আমারে হেরিলে,
আমা বিনা সে তো নাহি জানে আর।

(শ্রীবৎস-চিন্তা)

বিষাদ ভাব—

নল —এই ত ছেদিনু বাস।
মম অদর্শনে
পতিপ্রাণা বাঁচিবে কি প্রাণে?
চন্দ্রাননে! ক্ষমা কর অধমেরে,
সুদিন উদয় যদি কভু হয়—
প্রিয়তমে! দেখা হবে;
নহে, এই শেষ দেখা!
ছি! ছি! আমি কি নির্দ্দয়,—
আমা বিনা যে কভু না জানে,
একা রেখে দুর্গম কাননে
কোন্ প্রাণে যাব চলে?
হায়! কে যেন রে বলে,
"এসো, এসো, বিলম্বে জাগিবে বালা।"
যাই প্রিয়ে! যাই।
দেখ দেখ যতেক দেবতা,—
সতী একা বনমাঝে।
হে মধুসূদন!
শ্রীচরণ অভাগীরে দিও,—
আহা! দুঃখিনীর কেহ আর নাই!
দেখ দেখ, ক'রো হে করুণা,
অবলা ললনা
আমা বিনা হবে উন্মাদিনী;

চিন্তামণি। নিরুপায়, দিয়ো হে আশ্রয়।
আর কেহ নাই—
শ্রীচরণে পত্নী সঁপে যাই,
দয়া কর দয়াময়।
আসি প্রিয়ে, মাগিছে বিদায়। (নল-দময়ন্তী)

বিষাদ ভাব—

জনা—দূরে—দূরে—ভীষণ প্রান্তরে—
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—
হেথা তোর নাহি স্থান!
দুর্গম কান্তারে, তুষার মাঝারে,
পর্ব্বত-শিখরে চল!
চল পাপ রাজ্য ত্যজি—
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল পুত্রশোকাতুরা—
চল বালুময় বেলায় বসিয়ে
দেখিবি বাড়বানল।
চল যথা আগ্নেয় ভূধর
নিরন্তর গম্ভীর হুঙ্কারে
উগারে অনল-রাশি।
চল যথা বাসুকির শ্বাসে
দগ্ধ দিগ্‌দিগন্তর।
চল যথা ঘোর তম মাঝে
খেলে নীল প্রলয়-অনল
লকলকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা!
দূরে—দূরে—
হেথা তোর নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুরা।

(জনা)

কোমল ভাব—

সতী—ভোলানাথ? কে সে পিতা?
দক্ষ—ভুল সৃষ্টি আপাদমস্তক,
আপাদমস্তক ভোলা!
সতী—সকলই কি যায় ভুলে?
যদি কেহ কহে কটু,
তাও যায় ভুলে?
দক্ষ—(স্বগত) অনাচার নিবারণ—
সতী—পিতা পিতা, সকলই কি যায় ভুলে?
দক্ষ—হুঁ। (স্বগত) কিসে হয় অনাচার নিবারণ?
সতী—আমি বড় ভালবাসি তারে।
ভুলে যায় কে খাওয়ায় অন্নপানি? ইত্যাদি—

(দক্ষযজ্ঞ)

চিন্তামণি—(স্বগত) দিন গেল, ফের রাত হ'ল—একা ঘরে শোব—
বেশ্যার পুরী। ইত্যাদি—

(বিল্বমঙ্গল)

সুশীলা—(একখানি ছবি লইয়া) প্রাণনাথ! সঙ্গতি ছিল না, ফুলের মালা কিনতে পারি নি, চক্ষের জলে মালা গেঁথেছি, পর। হৃদয়েশ্বর! প্রাণবল্লভ! আর দাসীকে ভুলে থেকো না, দাসী কতদিন বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করবে? নাও নাথ! আমায় সঙ্গে নাও। প্রভু! প্রাণবল্লভ! দাসীকে কেন ভুলে আছ? দাসী ত তোমা ভিন্ন জানে না। আর নীরবে থেকো না—কথা কও, দাসীর প্রাণ শীতল কর। আমি বড় তাপিত, আমায় শীতল কর। ইত্যাদি—

(হারানিধি)

প্রতিহিংসা ভাব—

জনা—হুহুঙ্কারে দীর্ঘশ্বাস ছাড় সমীরণ!
ঘোর ঘন
গভীর গর্জ্জনে কর ধারা বরিষণ।
মরেছে প্রবীর,
শোক-অশ্রু ঢালে নাহি কেহ—
অনল কেবল!
শোক নাই জনার হৃদয়ে।
তিমির-বসনে বজ্র-অগ্নি-আভরণে,
সাজ নিশা ভয়ঙ্করী,
হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম—
ঘন-বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভা,
অস্ত্রাঘাত কুমারের অঙ্গে যত,
আছে থরে-থরে হৃদয় মাঝারে—
হেরে জনা, আর কেহ নাহি দেখে।
ভীষণ শ্মশান-ভূমি নিবিড় আঁধারে,
পুত্র পুত্রবধূ মম লুটায় যথায়—
ঘোর তমাবৃত বিকট শ্মশান
জনার অন্তরে,—
দেখে জনা, কেহ নাহি দেখে আর।
জ্বলে তার প্রতিহিংসানল,
মুষল-ধারায়
শত্রুর শোণিত বিনা নির্ব্বাণ না হবে,
সে আগুন কভু না নিভিবে,
যতদিন রবে জনা ধরাতলে।
ভস্মীভূত হয়েছে সকলি,
জলে স্মৃতি ভস্ম নাহি হয়।

নিশীথিনী
চামুণ্ডা-রূপিণী যথা আঁধার বসনে,
তাপ-ধূমে চামুণ্ডা-রূপিণী জনা—
শত্রু-বক্ষ-রুধির-লোলুপা।
হুহুঙ্কারে হাঁক সমীরণ,
কঠোর কুলিশ পড় উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে,
জ্বাল আলো দেখাতে আঁধার,
নিবিড় আঁধার প্রকৃতি বেড়িয়া রহ,
ঘোর তমঃ—
জনার হৃদয় মগ্ন যে তম-মাঝারে।

(জনা)

মাতৃভাব—

জনা—জান কি মায়ের প্রাণ ?
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে,
সেইদিন হতে
দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতি মাঝে ;
জাগে মার মনে—
নিরাশ্রয় শিশু
কোলে শুয়ে করে স্তন-পান,
জাগে মার মনে
খুলে দুটি প্রফুল্ল নয়ন,
মার মুখ চেয়ে বিধুমুখে মৃদু হাসি,
জাগে মার মনে
আধ ভাষে মাতৃ-সম্ভাষণ,—
চুম্বন-গ্রহণ-আশে লহর তুলিয়ে
ঘন ঘন চাহে শিশু—
মার মনে জাগে নিরন্তর,

করিলে তাড়না,
ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে
ভয়ে হেরে মায়ের বদন,
জাগে সে নয়ন মনে,—
ধূলায় ধূসর
ক্ষুধা পেলে মা বলে বালক ধেয়ে আসে।
জান কি মায়ের প্রাণ—
অসহায় শত্রু-অস্ত্র-ঘায়
কুমার লুটায় বিকট শ্মশান-ভূমে!
হত পুত্র শত্রুর কৌশলে,
পতিপ্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়,
মা হয়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি!
জান না—ধরনি গর্ভে তারে,—
জান না—জান না—
কি বেদনা বেজে আছে বুকে! (জনা)

দেশ-প্রীতি ভাব (হিন্দুর পতনের কারণ)—

রণেন্দ্র—কি হেতু মোগলগণ অজেয় ভারতে?
বীর্য্যহীন হিন্দুগণ এ নহে কারণ—
মেরুশির, উপত্যকা, বিশাল প্রান্তরে
হিন্দুর বীরত্ব-গাথা রয়েছে অঙ্কিত।
হিন্দুর পতন, অনৈক্য কারণ;—
দ্বেষ-হিংসা পরস্পরে,
উচ্চ-নীচ জাতি-অভিমান—
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে,
ধর্ম্ম-অভিমানে,
স্বজাতি-বান্ধব পরিত্যাগ।

অন্যথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে
হীনমতি অশাস্ত্রীয় শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনি',
অশাস্ত্রীয় হীন বিধি করিয়া আশ্রয়,
ভেদবুদ্ধি জন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ শাস্ত্রের মর্ম্ম করিয়ে লঙ্ঘন,
স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে,
ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।

দেশ-প্রীতি ভাব (হিন্দুর উত্থানের উপায়)—

রণেন্দ্র—মৃত্যুরে যে ডরে, বিপদে আশঙ্কা যার—
উচ্চকার্য্যে একাকী না হয় অগ্রসর—
কার্য্য করে অন্যের আশ্রয়ে—
মোক্ষের কি সেই জন অধিকারী?
মোক্ষলুব্ধ মহাত্মা না দেখে ফলাফল—
চাহে সৎকার্য্যের ভার,
কার্য্য অনুষ্ঠান জীবনের সার,—
একা, বহু, না করি বিচার,
আত্মত্যাগে অভিপ্রেত কার্য্যে হয় ব্রতী,—
হেন মহাজন ধরে অমোঘ শকতি।
মুক্ত সেই পুরুষ-প্রধান,
সংসারে অসাধ্য কিবা তার?
হে ধীমান্! মোরা সবে সৎনাম আশ্রিত;
উচ্চরবে সৎনামের জয় করি গান,
মহাকার্য্য করি অনুষ্ঠান,
রাখি মাতৃভূমি-মান,
ধর্ম্মের গৌরব ব্যক্ত করি পুণ্যধামে।

এস ভাই, মোক্ষলুব্ধ-চিত্ত কেবা,
এস, এস, মহাকার্য্যে কর যোগদান।

বীরাঙ্গনা ভাব—

১মা যুবতী—সখি, আমরা হীন নারী, আমাদের হ'তে কি হবে?

বৈষ্ণবী—আমরা হীন! লোকে আমাদের হীন বলে, তাইতে আমরা হীন। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন নারীগর্ভে জন্মেছেন, নারীর জন্য লক্ষ্য ভেদ করে শত রাজাকে পরাজয় করেছেন। আমরাই বীর প্রসব করি। সহধর্ম্মিণীরূপে আমরাই বীরকে উৎসাহ দিই। সকলই নারীর—সংসার নারী-চালিত। আমরা হীন! অকারণ আমরা আমাদের হীন বিবেচনা করি।

১মা যুবতী—সখি, আমরা খেলার জিনিষ, আমাদের নিয়ে খেলা করে।

বৈষ্ণবী—আমরা খেলার জিনিষ হই, তাই আমাদের নিয়ে খেলা করে। আমাদের রূপ-লাবণ্য, হাব-ভাব, মুনিমুগ্ধকারিণী সঙ্গীতধ্বনি, কাব্যালাপ, এসব কি খেলার জিনিষ? যাতে দেবতা মুগ্ধ হয়, তা কি খেলার জিনিষ?

৩য়া যুবতী—দিদি, তোর সব কথাই খেপীর মত।

বৈষ্ণবী—খেপীই হই আর যাই হই, আমার প্রতিজ্ঞা যে, ভীরু-পুরুষকে কখনই অঙ্গস্পর্শ করতে দেব না। যে নারী-প্রকৃতি, সে আবার নারী-স্পর্শ করবে কেন? আমি বীর-বেষ্টিতা বীর-নারী হয়ে বেড়াবো।

২য়া যুবতী—আচ্ছা ভাই, দেখি তুমি কি খেলাটা খেল।

বৈষ্ণবী—আমার খেলা নয়,—আর ভারত-ললনার খেলার সময় নাই। ভারত-ললনা অনেকদিন ঘুমিয়েছে, আর ঘুমের সময় নাই। কুলাঙ্গনারা চির-পরাধীনা, স্বামীর অধীন হয়ে উৎসাহবিহীনা হয়েছে। ভারতকে উৎসাহ প্রদান আমাদের কাজ, কুলাঙ্গনাকে উৎসাহ প্রদানে শিক্ষাদান

আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য হিন্দুর অসি কোষ-মুক্ত দেখা আমাদের কাজ, ধর্ম্মের জন্য দেশের জন্য বক্ষের শোণিত প্রদান করতে উত্তেজনা করা আমাদের কাজ। এসো, সেই কার্য্যে নিযুক্ত হই ; হীনের হীন হয়ে উচ্চ অপেক্ষা উচ্চ হবো।

(সৎনাম)

বীর ভাব—

বিশ্বামিত্র—হীন তুমি, হীন বাণী কহ সেই হেতু।
হয় হ'ক ইন্দ্র বাদী, দেবগণ সনে ;
না আসে বশিষ্ঠ যজ্ঞে, কিবা চিন্তা তার ?
যজ্ঞপূর্ণ তপোবনে করিব নিশ্চয়।
ত্রিশঙ্কু ত্রিদিবে স্থান নিশ্চয় পাইবে,—
মম কার্য্যে বিঘ্ন করে হেন শক্তি কার ? (তপোবন)

রাবণ—এতক্ষণ কাটিতাম শির তব,
কিন্তু ভীরু তুই,
সে হেতু না ছুঁই তোরে।
সত্য যদি অভিপ্রায় তব,
রাম যদি নারায়ণ—
মূঢ় !
অকারণে কেন কর তপ ?
রাখ কীর্ত্তি, নারায়ণে হয়ে বাদী।
দর্পে যাহ দেহ ত্যজি,
রাখ রাক্ষস-গরিমা ভবে।
বাক্য মম জানিহ নিশ্চয়—
চন্দ্র সূর্য্য যদি হয় ক্ষয়
বাক্য মম না নড়িবে।

অমর নহিক আমি ;
ঘুষিবে সংসারে
দুরাচার আছিল রাবণ,
সদাশয় কেহ বা কহিবে,

এ সংসারে কেহ না বলিবে
ডরে কার্য্য ত্যজিল রাবণ।
রাম যদি নারায়ণ,
ছলে লক্ষ্মী আনি তার হরি—
উচ্চ কার্য্যে রাবণ না ডরে।

(সীতাহরণ)

বাংলা দেশে শিবের স্তবে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"রজতগিরিসন্নিভং চারুচন্দ্রত্রিনেত্রং"—এই হইল বাংলা দেশের বিশেষ কবিত্ব-শক্তি। এইজন্য এই স্তব শিবের প্রণাম-কালে সকলেই বলিয়া থাকেন। ইহা যে খুব প্রযোজ্য হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু গিরিশচন্দ্র অন্য ভাবে শিবের বর্ণনা করিলেন—তিনি বলিলেন, "রজত ভূধর নিন্দি কলেবর" অর্থাৎ রজত পাহাড় বা রৌপ্যের পাহাড়ও তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে, শিবের বর্ণ এত জ্যোতির্ম্ময়। অপর স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্র কলেবর" অর্থাৎ শুভ্র বরফের পাহাড়, তাহাকেও অতিক্রম করিয়া শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় বর্ণ হইয়াছে। বাংলার পূর্ব্বতন কবিরা বলিলেন যে রজতগিরিসদৃশ ; কিন্তু গিরিশচন্দ্র বলিলেন, রজতগিরিও তাঁহার কাছে হীন হইয়া যায়।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হইল "শশাঙ্ক সুন্দর শোভে ভালে।" ইহা এত বিরাট্-কলেবর যে আকাশের শশাঙ্ক ব

চন্দ্র ললাট পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহার উর্দ্ধেও তাঁহার মস্তক উন্নত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ বিরাট্-ভাবের বর্ণনা অন্যত্র এত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। Miltonএর বর্ণনা হইল "Big Norwegian pine is but a wand" অর্থাৎ নরওয়ে দেশীয় দেবদারু বৃক্ষ যেন হাতের একটা ছড়ির মত, কিন্তু ইহাতে আকৃতির দীর্ঘত্ব বা মাধুর্য্যের কোন বিকাশ পায় নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বিরাট্ পুরুষের অনুভূতি অতি মনোহর ও মাধুর্য্যপূর্ণ। মাধুর্য্যের আর এক বিশেষ লক্ষণ যে "ত্রিনয়ন প্রেমধারে ঢল ঢল"—জীবের কল্যাণের জন্য মহাদেব যেন বিভোর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন, ভালবাসা যেন অশ্রুবারি হইয়া চক্ষুর মধ্যে রহিয়াছে। এইটি হইল মাধুর্য্য-বর্ণনার সুন্দর উদাহরণ।

এস্থলে তিনি একটি নূতন কথারও সৃষ্টি করিয়াছেন—"ফণী ফণ্ণ ফণা" অর্থাৎ ফণাটাকে ফোঁস করিয়া তুলিয়াছে। এইটি নূতন শব্দ কিন্তু বিরাট্ পুরুষের বর্ণনা বা অনুভূতি এইখানেই পর্য্যাপ্ত হয় নাই। পুনরায় তিনি বলিলেন, মস্তকের জটা হইতেছে আকাশের মেঘপুঞ্জ, "জটা জলদজাল মাঝে"। এই সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে, এইরূপ বিরাট্ পুরুষের কল্পনা অল্পসংখ্যক কবির ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্র বাংলা ভাষায় যে কিরূপ নূতন প্রকার অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার কয়েকটি উদাহরণ উপরে প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বহু গ্রন্থে, বহুভাবের বহু প্রকারের বহুবিধ অলঙ্কার প্রযুক্ত হইয়াছে—অর্থাৎ হীরা জহরৎ ঝোড়া করিয়া লইয়া তিনি কোন বিচার না করিয়া দুইহস্তে সর্ব্বদিকে

ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। প্রাণস্পর্শী, জীবনপ্রদ, জ্বলন্ত প্রদীপ্ত ভাবপূর্ণ অলঙ্কার তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করা আবশ্যক। "গিরিশ-অলঙ্কার" নামক গ্রন্থ রচিত হইলে জনসাধারণ তখন সম্যক্‌রূপে বুঝিতে সক্ষম হইবে যে তিনি বাংলা ভাষার কি অমূল্য সম্পদ্ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, অলঙ্কার কাহাকে বলে? অলঙ্কার হইল, শব্দকে এইরূপভাবে সমাবেশ করিতে হইবে যাহাতে স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রোতার মন অভিভূত হইতে পারে। ব্যাকরণ, ভাষার শব্দসকলের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়। অলঙ্কারের উদ্দেশ্য হইল, শব্দ সংযোগ করিয়া এমন ভাব-তরঙ্গ তুলিতে হইবে যাহাতে শ্রোতার মন অল্প সময়ের ভিতর প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠে। ইহাই হইল অলঙ্কারের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ। অলঙ্কার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর বলা যাইতে পারে: এক হইল শব্দ-বিন্যাস-দ্বারা মনের ভাব বিকাশ করা, এবং অন্যটি হইল মুখভঙ্গী ও হস্ত-সঞ্চালন-দ্বারা হৃদ্‌গত ভাব বিকাশ করিয়া দর্শককে অভিভূত করা। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অলঙ্কারকে অভিনয় বলে। উভয়ের ভিতর সামান্য পার্থক্য আছে। শব্দ দিয়া যে সকল অলঙ্কার বিকাশ করা যায় তাহা স্থায়িভাবে থাকে। হস্তাদি সঞ্চালন-দ্বারা যে সকল ভাব বিকশিত হয় তাহা উপস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রযুজ্য হয় কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার কোন সার্থকতা থাকে না; সেই জন্য ইহাকে দ্বিতীয় স্তরের অলঙ্কার বলা হয়। অলঙ্কার সর্ব্বসময়ে জাতির ভিতর সমভাবে থাকে না। কালানুযায়ী নানা পরিবর্ত্তনেব ভিতর জাতির ভাব যেমন

পরিবর্ত্তিত ও নানাদিকে প্রধাবিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, ভাষা এবং শব্দেরও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহাই হইল জীবন্ত জাতি ও জীবন্ত ভাষার লক্ষণ। সেইজন্য অলঙ্কার ও মাধুর্য্যপূর্ণ শব্দ-রচনা নবভাবে সৃষ্ট হইয়া থাকে। নূতন জাতি যখন জাগ্রত হয় তখন তাহার সর্ব্বদিক্ হইতেই নূতন ভাব-সম্পদ্ সৃজনের আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ মনোমধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তখন সে চায়, নূতন বীর্য্যবান্ জাতি গঠনের উপযোগী ভাব-সম্পদ্। সেইজন্য পুরাতনের নব কলেবর ঘটে, কারণ নূতন বলিয়া কোন বস্তু নাই। পুরাতনকে নূতন দৃষ্টিতে দর্শনের নামই নববস্তু।

ভারতবর্ষ, পারস্য ও আরব দেশের যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে তাহার ভিতর অলঙ্কার-অংশ অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, রাজা বা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি একটি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। কিঞ্চিৎ দূরে কতিপয় পরিষদ্ বা লালিতক ও বিট অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের বর্ণনার বিষয় হইতেছে বন, উপবন, সরোবর ও প্রমোদ-কাননের উপাখ্যান। কোন ব্যক্তিই গৃহাভ্যন্তর হইতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উত্তাপে যাইতেছেন না, সকলেই প্রকোষ্ঠান্তরে বসিয়া জগৎ দর্শন করিতেছেন। এই হইল প্রাচীন ভারতীয়, পারস্য ও আরব দেশের অলঙ্কারের প্রথম ভাব। ইহাকে সভাস্থল-অলঙ্কার বা দরবারী-অলঙ্কার বলা হয়। এই অলঙ্কারের বর্ণনা-বিষয় অতীব সুন্দর। একটি ভাব মানিয়া লইলে তাহাকে ফেনাইয়া এমন রস-সম্ভার রচনা করিবে যে শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার সমস্ত রচনাই হইল কল্পনাপ্রসূত। এই সকল অলঙ্কারে অনুপ্রাস (Alliteration) বা এক শব্দের

বিভিন্ন অর্থ (Pun) দেখান হইয়া থাকে ; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম যে, এই সকল অলঙ্কারের ভিতর প্রাণস্পর্শী, প্রদীপ্ত, সতত উৎসাহী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে বিষাদ, হতাশ, মুমূর্ষু, রোরুদ্যমান ভাব প্রকাশমান হয়।

গ্রীক্‌দিগের অলঙ্কার হইল গণতান্ত্রিক অলঙ্কার। গ্রীক জাতি ও রোমান জাতি গণতান্ত্রিক ছিল। জনসাধারণকে বা গণসমূহকে অল্প ভাষায় অল্প সময়ের ভিতর উত্তেজিত ও অভিভূত করিয়া কিরূপে স্বপক্ষে আনিতে হয় এবং নিজ মতাবলম্বী করিতে পারা যায়, এই প্রচেষ্টানুযায়ী গ্রীকদিগের অলঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইজন্য ইহাকে Democratic বা গণতান্ত্রিক অলঙ্কার বলা হয়। দরবারী-অলঙ্কারে সকলে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে ও দক্ষিণহস্ত সঞ্চালন করিতেছে। গণতান্ত্রিক অলঙ্কারে বক্তা বা বাগ্মী দণ্ডায়মান হইয়া বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া বামহস্ত সঞ্চালন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে অভিভাষণ করিতেছে এবং বামহস্তের তর্জ্জনী ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া সঙ্কোচ ও বিকোচ করিতেছে। অধিকাংশ মনোভাব তাহারা বাম অঙ্গ দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, কারণ দক্ষিণ অঙ্গ দিয়া মনোভাব বিকাশ করিলে প্রচলিত ও সাধারণভাবের মনোভাব বলিয়া পরিগৃহীত হয় ; এইজন্য আকস্মিক ভাব দেখাইতে হইলে বাম অঙ্গের সঞ্চালন আবশ্যক হয়।

ইংরাজী ভাষার অলঙ্কার গ্রীকদিগের নিকট হইতে আসিয়াছে। রোমক জাতি গ্রীক অলঙ্কার লইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। ইহাকে গ্রীক-রোমান মিশ্রিত অলঙ্কার বলা হয়। আধুনিক ইউরোপে এই শ্রেণীর

অলঙ্কারই প্রচালত। ইংরাজী ভাষায় এই মিশ্রিত অলঙ্কার সামান্য মাত্র অদলবদল হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গণতান্ত্রিক অলঙ্কার এশিয়ার দরবারী-অলঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। একটি হইল রাজা, মহারাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তির মনস্তুষ্টির জন্য সতত আগ্রহশীল, এবং অন্যটি হইল জনসাধারণকে প্রলুব্ধ ও উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য। ইহাই হইল দুই শ্রেণীর অলঙ্কারের ভিতর পার্থক্য, কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—অর্থাৎ কিরূপে শ্রোতার মনকে অল্প সময়ের ভিতর অভিভূত করা যাইতে পারে।

এইস্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে, গিরিশচন্দ্রের অলঙ্কার কোন্ পর্য্যায়ের? তাঁহার অলঙ্কার আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি পুরাতন ভারতীয় অলঙ্কার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ বা বর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার নিজস্ব অলঙ্কারের ভিত্তি বা বনিয়াদ পুরাতন রাখিলেন, সেস্থলে কোন হস্তক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু উপরকার ইমারত বা কাঠামো অলক্ষিতে, অতর্কিতভাবে ও অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিলেন। এই পরিবর্ত্তন সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিবর্ত্তনকালে এইরূপ ধীরভাবে ভাব-সম্পদ সঞ্চারিত করা বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান মনীষী বিবর্ত্তন সৃষ্টি করেন, তিনিই বিবর্ত্তনের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তিনিই বিবর্ত্তনের পরিসমাপ্তি করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার রচনা-সৃষ্টিতে কোনস্থলে ইংরাজী অলঙ্কারের রেখাপাত পরিলক্ষিত হয় না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে,

ইংরাজী ভাবধারা তাঁহার মনোমধ্যে যে স্থান পায় নাই তাহা নহে, কিন্তু কোন স্থলেই তিনি অনুসরণকারীর কার্য্য করেন নাই। জাতির ভাবানুযায়ী, জাতির আবশ্যকানুযায়ী, জাতির প্রবৃত্তি ও গতি অনুযায়ী অলঙ্কার সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গিরিশচন্দ্র নূতন অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রোতার, সমাজের মনোবৃত্তি অনুযায়ী কাব্যের চরিত্রোক্ত অলঙ্কার দর্শাইতে হয়, কারণ কাব্য হইল সমাজের আভ্যন্তরীণ চিত্র।

তিনি প্রাচীন ভারতীয় ও ইংরাজী অলঙ্কারের সংমিশ্রণে নিজস্বভাবে নূতন অলঙ্কার সৃষ্টি করিলেন। জাতির মনোভাব যেরূপ, অলঙ্কারশাস্ত্রও তদ্রূপ রচনা করিতে হয়। ইহা কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী নহে। সময়কালীন জনসাধারণ যেরূপ মনোভাব প্রকাশ করিবেন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী মনোবৃত্তি যেরূপ প্রধাবিত হইবে, অলঙ্কারশাস্ত্রও তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে। ব্যাকরণের সহিত অলঙ্কারের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত মনস্তত্ত্বের অংশ বিশেষ। জাতির পুরাতন ব্যাকরণ, ভাষা ও শব্দের পরস্পরের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য নির্ণয় করিয়া দেয়. কেবলমাত্র যে ইহাই করে তাহা নহে ভাষা ও শব্দ প্রয়োগকে সংযত ও নিয়মাধীন করিয়া থাকে। কারণ ইহা অনেক সময় অপরিবর্ত্তনীয়। এইজন্য প্রাচীন ভাষা অধ্যয়ন করিতে হইলে প্রাচীন ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্র অন্যবিধ—যদিও ভাষার সহিত ইহার বহু সংশ্লিষ্ট ভাব আছে। জাতির সর্ব্ববিধ মনোভাব অলঙ্কারশাস্ত্র দিয়া প্রকাশ করা হয়। জাতির অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহার উত্থান ও পতন

কালীন ভাব-তরঙ্গ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেইজন্য মনস্তত্ত্ব ও জাতীয় মনোবিজ্ঞানের সহিত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

প্রত্যেক জাতির ভাব-প্রকাশের নিজস্ব ধারা আছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের ভিতর নানাবিধ প্রথা আছে। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি জাতির ভিতর মনোভাব প্রকাশ করিবার প্রণালী বিভিন্ন। এইরূপ এসিয়াবাসীদিগের ভিতরও যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। ভারত, পারস্য ও আরব প্রভৃতি জাতির মধ্যেও ভাব প্রকাশের প্রথার কিঞ্চিৎ পরিমাণে তারতম্য দৃষ্ট হয়। ইউরোপ ও এসিয়ার বিভিন্ন সহর ও গ্রামসমূহ পদব্রজে পরিভ্রমণকালে, উপরোক্ত প্রদেশ সমূহের বহুবিধ স্তরের নর-নারীর সহিত আমি বসবাস করিয়াছি। সেইজন্য তাহাদের আচার, ব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আছে। এস্থলে ঐ সমস্ত জাতি সমূহের সম্বন্ধে যেটুকু বলা নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই প্রকাশ করিলাম। ঐ সকল জাতির মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এস্থলে বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

এক্ষণে আমার বক্তব্য হইতেছে, গিরিশচন্দ্র কতদূর পর্য্যন্ত পুরাতন অলঙ্কার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি কিরূপ কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব। তাঁহার নাটকাবলী অধ্যয়ন করিলে প্রথমেই পরিলক্ষিত হয় যে, বর্ণিত চরিত্র সকল কেহই সম-ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে না। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, বিভিন্ন স্থানের লোক, বিভিন্ন উপজীবিকার লোক, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে

কথাবার্ত্তা কহিতেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব-সম্পদ্ অল্পসময়ের ভিতর সুস্পষ্টভাবে অন্যকে বুঝাইবার জন্য বহুবিধ শব্দ রচনার পন্থা অবলম্বন করিতেছে। ইহা হইল তাঁহার রচনার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়। ভাষা, বর্ণসংযোজনা এবং মনোভাব কিরূপ শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়া ভাব বিকাশ করিতেছে, তাহা বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিবার বিষয়। ইহাতে গিরিশচন্দ্রের নূতন প্রকার অলঙ্কার সৃষ্টির মহতী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে ভাবানুযায়ী নানাপ্রকার অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে: "কাঁদি কাঁদি মানুষ," "এই ধরে ত এই গেলে," "গঙ্গা বিলোলা"। নেত্রে জল পরিপূর্ণ হওয়াকে বিলোলা বলে—গঙ্গার জল কিনারা পর্য্যন্ত কানায় কানায় হইয়াছে, যেন উপ্‌চিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, এই সুন্দর ভাবটি প্রকাশ পাইতেছে। "ফণি ফণ্ণ ফণা" অর্থাৎ সাপ ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিতেছে। "জটা জলদজাল মাঝে" অর্থাৎ শিবের জটা মেঘের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাতে মহা-বিরাটের ভাব এস্থলে আসে। "রজত ভূধর নিন্দি কলেবর" অর্থাৎ রূপার পাহাড়ও নিন্দিত হইয়া যাইতেছে, তাহা হইতেও অধিকতর শুভ্র। এইরূপ অলঙ্কার ও ভাষা-রচনার নৈপুণ্য যথেস্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। শব্দ-প্রয়োগও যেমন বহু প্রকার, রচনা-প্রণালীও সেইরূপ নানাবিধ।

গিরিশচন্দ্রের অলঙ্কার কিরূপে নিজস্ব, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাব ধারণ করিল, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম-কানুন কিছু জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি প্রধান কারণ বা উপাদান হইল যে, দ্রষ্টব্য বস্তু সম্মুখ হইতে বা পশ্চাৎ হইতে দ্রষ্টা দেখিবে না, কিন্তু এমন একটি ক্ষেত্র বা কোণ হইতে দেখিবে যাহাতে সম্মুখ-পশ্চাতের উভয়বিধ ভাবের সংমিশ্রণ হয়—দ্রষ্টা নিজেকে অসংশ্লিষ্ট রাখিয়া উভয়বিধ ভাবপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য দর্শন করিবে। এইটিই হইল অলঙ্কারশাস্ত্রের বিশেষ লক্ষণ। কারণ সম্মুখ হইতে দর্শন করিলে বদ্ধভাব আনয়ন করে অর্থাৎ দৈনন্দিন নীরস ভাবটা আসিয়া যায়। যদি পশ্চাৎ দিক্ হইতে দর্শন করা যায় তাহা হইলে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু উপযুক্ত কোণ বা ক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করিয়া অলক্ষিতে, অসংলগ্ন, অসংশ্লিষ্ট হইয়া দর্শন করিলে নূতন ভাবে বস্তুটী উপলব্ধি করা যায়। ইহাকেই বলে কবিত্ব-শক্তি এবং এই ভাব বিকাশ করাকেই অলঙ্কারশাস্ত্র বলে। মনোবিজ্ঞানানুযায়ী বলিলে বলিতে হয় যে, দ্রষ্টা বা লেখক নিজের মনকে দ্বিধা করিয়া কল্পিত চরিত্রের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে—এক অংশ তথায় থাকিয়া উপযুক্ত ভাবরাশি প্রকাশ করিতেছে এবং অন্য অংশ নিজের ভিতর থাকিয়া সেই সকল ভাবপুঞ্জ নিরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে; এক কথায়, দ্রষ্টাই দ্রষ্টব্য হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের ইহাই হইল এক বিশেষ অঙ্গ। গিরিশচন্দ্র এই ভাবে জগৎ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া নিজে চরিত্রের ভিতর দিয়া একই কালে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বর্ণিত কল্পিত চরিত্রসকল এত তেজঃপূর্ণ ও মাধুর্য্যপূর্ণ—প্রত্যেক চরিত্রটি সুস্পষ্ট এবং জীবন্ত।

গিরিশচন্দ্রের রচনার ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় যে,

বীর্য্যবান্ জাতি গঠন করিবার তাঁহার অদম্য প্রচেষ্টা ছিল। জাতির ভিতর কিরূপ ভাবে শক্তি আনিতে হয়, জাতিকে কিরূপে জাগ্রত করিতে হয়, জাতির ভিতর কিরূপে তেজঃপূর্ণ-ভাব দিতে হয়, ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সহিত কথোপকথন-কালে তিনি ইহা সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যের ভিতরও সেই ভাবটি পরিপূর্ণ-ভাবে জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। মাইকেল বীরভাবের কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বগামীদিগের বীর-চরিত্র-চিত্রণের প্রথা অনুসরণ না করিয়া বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়া, বিভিন্ন চরিত্রের আচরণ দর্শাইয়া সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী ও নির্ভীক ভাব দর্শাইয়াছেন—যখন যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তখন সেই চরিত্রের ভিতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী, নির্ভীক ও একাগ্র ভাব বিকাশ করিয়াছেন। ইহাই হইল তাঁহার জীবন-কাহিনী, ইহাই হইল তাঁহার বর্ণিত চরিত্রের মেরুদণ্ড।

নিজের প্রকৃত যে মনোভাব এবং মনোমধ্যে যে সময়ে যেরূপ ভাবতরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাঁহার বর্ণিত চরিত্রগুলি সেই মনোভাবের পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি। তিনি কঠোর অবোধ্য শব্দ বা ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সরল সহজবোধ্য গ্রাম্য শব্দ বা প্রচলিত শব্দ-দ্বারা চরিত্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভাব দর্শাইয়াছেন। বিল্বমঙ্গল রাত্রে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে দুর্য্যোগ নিশীথে তরঙ্গ-সঙ্কুল নদী সাঁতরাইয়া পার হইতেছে, চণ্ড ভীলদিগকে লইয়া রণক্ষেত্রে যাইতেছে, পূর্ণচন্দ্র সব ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, বুদ্ধ একটি ছাগলের প্রাণরক্ষার জন্য অকাতরে নিজের মস্তক দান করিতেছেন; মনস্তত্ত্বানুযায়ী ইহারা সকলেই এক ভাবাপন্ন—

সেই নির্ভীক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভাব। "বেল্লিক বাজারে" একটি পাগলা ছোঁড়ার মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন, "না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" এইরূপ ভাবে তিনি বহু চরিত্রের ভিতর দিয়া বীর্য্যবান্ জাতিগঠনের ভাবধারা প্রকাশ করিয়াছেন। জাতির অভ্যুত্থান ও উন্নয়ন তাঁহার জীবনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য তাঁহার প্রথম রচনাসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা পরিলক্ষিত হয়। ইহাই হইল গিরিশচন্দ্র ঘোষের অলঙ্কারশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস। ইহাই হইল তাঁহার অলঙ্কার-রচনার রীতি বা প্রথা। এইরূপে তিনি নূতন প্রকারের অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণভাবে কল্পিত জগৎ সৃজন করিয়া তিনি উহাকে বাস্তব জগৎরূপে দেখাইয়াছিলেন। ইহাকেই বলে অলঙ্কারের অদ্ভুত শক্তি।

বাস্তব জগতের চিন্তাধারা, সম্পর্ক-পারম্পর্য্য-বিভাগ অতিক্রম করিয়া অবাস্তব জগতের চিন্তাধারা পারম্পর্য্য ও সম্পর্ক পরিদর্শন করান—যাহা কখন বাস্তব জগতের কেহই দেখে নাই এবং যাহা কার্য্যেও পরিণত করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ লোকাতীত জগতের ভাবরাশি, যাহা লৌকিক হইতে অলৌকিক হয়—এই সকল ভাবের বর্ণনা করাকেই অনেকে কবিত্ব-শক্তি বলিয়া থাকে। আমার মত হইতেছে যে, দৈনন্দিন বাস্তব জগতে পরস্পর যে সম্পর্ক আছে, তাহার ভিতর দেবভাব বা মাধুর্য্য প্রদর্শন করাই কবিত্ব-শক্তি। অবাস্তবের কোন আবশ্যক নাই। বাস্তব বস্তু বা সম্পর্কের ভিতর যে প্রাণ, দেবভাব বা ব্রহ্মন্ আছে তাহাই পরিস্ফুট করা হইল কবিত্ব-শক্তি।

বিদূষক-চরিত্র-অঙ্কন গিরিশচন্দ্রের এক অভিনব সৃষ্টি ও অক্ষয় কীর্ত্তি। এইরূপ চরিত্র-সৃজন ভারতীয় কাব্য-জগতের

প্রথম দৃষ্টান্ত। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাঁড় বা বয়স্যের অনুরূপ চরিত্র নহে। ইহা তাঁহার একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের নাটকীয় চরিত্র। কেহ যেন ইহাকে সেক্সপীয়রের ফল্‌ষ্টাফ্ বা ইংরাজী সাহিত্যের বফুনের সহিত তুলনা না করেন ; কারণ, দুই সাহিত্যের—অর্থাৎ ইংরাজী ও ভারতীয় মনোবৃত্তির—উদ্দেশ্য বিভিন্নমুখীন হওয়ায় এই দুই চরিত্র সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ মজ্জাগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। গিরিশচন্দ্র অনেক সময় বিদূষকের মুখ দিয়া উচ্চাঙ্গের কথাবার্ত্তা বলাইয়াছেন। তাঁহার "ধ্রুবচরিত্র" নাটক ১২৯০ সালে শ্রাবণ মাসে ষ্টার রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। সেই নাটকের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে আমরা প্রথম বিদূষক-চরিত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহার পর "নলদময়ন্তী"র বিদূষক, "শ্রীবৎস-চিন্তা"য় বাতুল, "বুদ্ধদেব-চরিত"এর বিদূষক, "জনা"র বিদূষক, "পাণ্ডব-গৌরব"এর বিদূষক, "বিল্বমঙ্গল"এর পাগলিনী, "অশোক"এর আকাল, "শাস্তি-কি-শান্তি"র হরমণি, "বলিদান"এর জ্যোবি, "তপোবল"এর সদানন্দ প্রভৃতি চরিত্রের মুখ দিয়া তিনি বহু উচ্চস্তরের ভাবরাশি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, গিরিশচন্দ্র এই বিদূষক-চরিত্রের উপাদান কোথা হইতে পাইলেন ? পূর্ব্বে আমাদের দেশের "যাত্রা"তে "কেলুয়া-ভুলুয়া" নামে দুইটি সঙ্ আসিত ; তাহাদের কার্য্য ছিল হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়া সমাজের সমস্ত দুর্নীতির সমালোচনা করা। ইহাদের পরে "মুনি গোসাঁই"-রূপে এক চরিত্র সভায় আগমন করিত ; তাহার কাজ ছিল অতি সারগর্ভপূর্ণ উপদেশ প্রদান করা। "কেলুয়া ভুলুয়া" যেমন হাস্যচ্ছলে অভিনয় করিত, "মুনি গোসাঁই" সেরূপ প্রকৃতির

ছিল না ; তাহার গুরুগম্ভীর বাক্যালাপ ছিল এবং কথাবার্ত্তায় সে অনেক শাস্ত্রীয় সদুপদেশ প্রদান করিত। অনেক সময় "মুনি গোসাঁই"এর অংশ বা পালা বিশিষ্ট পণ্ডিত রচনা করিয়া দিতেন। গিরিশচন্দ্র সেই মুনি গোসাঁই ও কেলুয়া ভুলুয়াকে একত্রিত করিয়া অন্য রূপে বিদূষকের পালা অভিনবভাবে দর্শাইয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণব বংশের সন্তান। বাল্যকালে তিনি বাড়ীর বৃদ্ধদিগের নিকট বসিয়া সমস্ত বৈষ্ণব উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের রসবস্তু তিনি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি সমস্ত ভাব বা বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তনে যে কয়েকটি অঙ্গ আছে তাহা নানা সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সঙ্গীতের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

গোপাল ভাব—

হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়,
রাণী পাছে তোলে কোলে,
রাণী কুতুহলে, ধর ধর বলে,
হামা টেনে তত গোপাল চলে।
প'ড়ে প'ড়ে যায়, ধূলা লাগে গায়,
আবার উঠে আবার পালায়।
মুছায় আঁচলে, রাণী কোলে তুলে,
ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়।
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে,
মাকে ধ'রে গোপাল দাঁড়ায় ;
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি,
টলে টলে কোলে ঝাঁপায়।

ক্রমেতে বাড়িল, গোঠেতে চলিল,
গোপের বালক চরায় ধেনু,
বনের মালায়, রাখাল সাজায়,
মজায় গোপী বাজায় বেণু।

(জনা)

পূর্ব্ব গোষ্ঠ—

হা রে রে রে রে রে, ওঠ রে কানাই,
বেলা হ'লো চল, চল গোঠে যাই,
আয় রে কানু আয়।
ওঠ রে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল,
পথ পানে সবে চায়॥
বেলা হ'লো চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাবি বাঁশরী,
দাঁড়াইয়ে পায় পায়।
বনফুল তুলে সাজাব তোরে,
আয় আয় কানু ওঠ রে ওঠ রে,
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু,
কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বা রবে,
তোরে ডাকে ধেনু, বনে যেতে নাহি চায়॥

(জনা)

উত্তর গোষ্ঠ—

গোধন ফিরে, ধীরে ধীরে ধীরে
গগনে ছাইল রেণু
(হাম্বা হাম্বা হাম্বা রবে)।
ডুবিল রবি, রক্তিম ছবি,
বাজিল মোহন বেণু॥

আকুল বেণী, ধাইল রাণী,
ঘন শ্বাস বহে তাহে।
ননী লয়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝরে,
অনিমিখ পথ চাহে ॥
গোঠে গহনে, ফিরায়ে গোধনে,
শ্রমবারি শ্যাম কায়ে।
অলকা তিলকা, মলিন রেখা,
শিখি পাখা দোলে বাঁয়ে ॥
ভ্রমর জিনি, নূপুর ধ্বনি,
রুণু রুণু রুণু বাজে।
বনমালা দোলে, বলা সাথে চলে,
করে ধরি ব্রজরাজে ॥
রাণী কুতূহলে, নিল কোলে তুলে
মা বলে ডাকিল কানু।
রাখাল মিলি, দিল করতালি,
নাদিল শত ধেনু ॥

(ভারানন্দি)

সাধারণ গোষ্ঠ—

'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেল্‌'ব কত ছুটোছুটি বাঁশী বাজাব ॥
খেল্‌তে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাইতে আসি—
আমার মনের মত খেলার জুটি কতজন পাব।

(বিল্বমঙ্গল)

আমরা রাখাল বালক,
মাঠে ধেনু চরাই।
ক্ষুধা পেয়েছে খেতে দে মাই ॥

নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে,
বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো, এসেছি তাই ॥
দে না মা যা দিবি আদর করে,
আদর করে দিলে মনে ধরে,
দেরি ক'র না মা, মোরা খেলিতে যাই ॥

(চৈতন্য লীলা)

বিরহ ভাব—

সাধে কি গো শ্মশান বাসিনী।
পাগলে করেছে পাগল, তাই ত ঘরে থাকিনি।
সে কোথা একল' ব'সে
নয়ন জলে বয়ান ভাসে,
আমা হারা দিশেহারা, ডাকছে কত না জানি ॥
ওই যেন সে পাগল আমার,
দেখ্‌ছি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি ॥

(বিল্বমঙ্গল)

অভিসার—

যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী—
প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদম তলায়
দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে ॥
যত বাঁশরী বাজায়
তত পথপানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়;
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে
চলে যাবে মানভরে ॥

মান—

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারারাত কি পাগল নিয়ে যায় গো মা, জাগা॥
সারারাতি সিদ্ধি বাটি,
ভূতে খায় মা বাটি বাটি,
বল্‌ব কি বল, বোঝে না মা,
তার ওপর মিছে রাগা॥
কাছে এসে ছাই মেখে বসে,
মরি গো মা ফণীর তরাসে,
কেমন করে ঘর করি মা নিয়ে এ গ্যাংটা নাগা॥

(বিল্বমঙ্গল)

রাই কাল ভালবাসে না।
কাল দেখে বলেছিল
কুঞ্জে যেন আসে না॥
রূপের বড় গরব করে রাই,
দেখব এবার মন যদি তার পাই,
এবার গৌর হয়ে ধরব পায়ে
আর ত কালো রব না॥
বড় অভিমানী রাই,
বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগিবেশে ফির্‌বো দেশে
ঘরে ত মন বসে না॥

(চৈতন্যলীলা)

মাথুর—

কেন রাই! একলা বসে
বয়ান ভাসে নয়ন নীরে?
কেঁদে কি পাবি তারে,
শ্যাম কি সখি চাবে ফিরে?

ছি ছি ছি ভালবেসে
যাস্‌নে লো সই যাস্‌নে ভেসে,
রাখ প্রাণ আপন বশে,
রাখালে প্রেম জানে কি রে ?

(ব্রজবিহার)

মরি লো প্রাণসই, জানিনে কৃষ্ণ বই,
যা গো যা প্রাণধনে আন না।
সই লো সই, কালা বিনে, বাঁচিনে, বাঁচিনে,
জেনেও কি প্রাণসখী জান না ?
আমার সে কালাচাঁদ, দেখবো বড় সাধ,
ম'লে সই আর তো দেখা হবে না॥
যা লো যা ত্বরা করি, আন লো পায়ে ধরি,
সে বুঝি এমন জ্বালা জানে না॥

(প্রভাস-যজ্ঞ)

মিলন-

এল কৃষ্ণ এল ঐ বাজে লো বাঁশরী।
সুখে শুক-শারী মুখোমুখি করি,
হের নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী॥
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়।
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে উঠ লো কিশোরী॥

(চৈতন্যলীলা)

বৃন্দাবনে নিত্য লীলা দেখরে নয়ন।
যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে,
রাধার পাশে মদনমোহন॥

নয় ত এ অনুভবে,
দেখরে যখন—নীরব রবে
এমন সাধের রতন সাধ করিস নি,
না জানিয়ে তুই কেমন।
(ছাখ) তেম্নি ক'রে মোহন বাঁশরী,
তেম্নি বামে ব্রজেশ্বরী—প্রেমের কিশোরী,
তেম্নি গোপী, তেম্নি খেলা,
শুনেছিলি রে যেমন ॥

(চৈতন্যলীলা)

গিরিশচন্দ্রের নাট্যগ্রন্থে দর্শনশাস্ত্রের অতি উচ্চভাবসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। "বুদ্ধদেব-চরিত" নাটকে সিদ্ধার্থ প্রথম প্রশ্ন করিলেন :—

কোথা ব্রহ্ম ? কোথা তাঁর স্থান ?
শুনি ত্রিভুবন স্বজন তাঁহার ;
তবে কেন রোগ শোক জরা,
দুঃখের আগার ধরা ?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম ?—ইত্যাদি

ইহাই হইল দর্শনশাস্ত্রের প্রথম উদ্বোধক প্রশ্ন। সংশয় হইতে প্রশ্নের জন্ম। এই প্রশ্ন হৃদয়ে উত্থাপিত না হইলে দর্শন-শাস্ত্রের উচ্চ ভাবরাশির উপলব্ধি হয় না। নির্ভীক ও স্বাধীন ভাবে "স্রষ্টা কে ?" এই প্রশ্ন উত্থাপন করা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির দ্বারা সম্ভবপর নহে। কেবলমাত্র শ্রদ্ধাসম্পন্ন নির্ভীক দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। যাঁহাদের হৃদয়ে এইরূপ গভীর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কেবলমাত্র তাঁহারাই ভবিষ্যতে দর্শনশাস্ত্রের নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়েন।

"বুদ্ধদেব-চরিত" নাটকে দেববালাগণ তিনটি সঙ্গীত গাহিয়াছেন:—

(১ম) জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই?
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই?
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি;
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়? আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন;
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।

(২য়) জানি না কেবা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায়?
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,—
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে, আর তখনি নাই!

(৩য়) কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল?
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল!
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই, যাই কোথা—কূল কি নাই?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
যে আছ চেতন, ঘুমায়ো না আর,
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই স্মরণ চাই।

ইহার দার্শনিক বাখ্যা হইতেছে—

"কোথা থেকে আসি"	অর্থাৎ	জন্ম কাহাকে বলে ?
"কোথা ভেসে যাই"	"	মৃত্যু কাহাকে বলে ?
"ফিরে ফিরে আসি"	"	পুনর্জ্জন্ম কাহাকে বলে ?
"কে খেলায়"	"	স্রষ্টা কে ?
"আমি খেলি বা কেন ?"	"	তাঁহার সহিত আমার কি সম্পর্ক ?
"কি কাজে এসেছি"	"	জীবনের উদ্দেশ্য কি ?
"কি কাজে গেল"	"	জীবনে কি করিলাম ?
"জানি না কেবা"	"	অহং কি বস্তু ?
"এসেছি কোথায়"	"	সৃষ্টি কি ও কাহাকে বলে ?
"কেন বা এসেছি"	"	উদ্দেশ্য কি ?
"যাই ভেসে ভেসে"	"	জীবনটা চলিয়া যাইতেছে।
"কত কত দেশে"	"	ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।
"চারিদিকে গোল"	"	চারিদিকে হাহাকার।
"উঠে নানা রোল"	"	চারিদিকেই গোলমাল।
"কত আসে যায়"	"	কত লোক জন্মাইল, কত চলিয়া যাইল।
"হাসে কাঁদে গায়"	"	কত চাপল্যই না করিল !
"এই আছে, আর তখনি নাই"	"	তারপর সব নিভিয়া গেল।

এই কয়েকটি হইল দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রশ্ন। আজ পর্য্যন্ত দর্শনশাস্ত্রে যত তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে, বর্ত্তমানে হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেও যে সকল তর্কের মীমাংসা হইবে, সমস্তই হইল ওই কয়েকটি প্রশ্নের নানাবিধ ব্যাখ্যা। এই কয়েকটি মূল প্রশ্ন লইয়া দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলী নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন; ইহার বাহিরে আর প্রশ্ন উত্থাপন হয় না। এই কয়েকটি প্রশ্ন লইয়া, সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু গিরিশচন্দ্র অপূর্ব্ব সঙ্গীতে

প্রকাশ করিয়াছেন; গিরিশচন্দ্রের কিরূপ উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ভাব ছিল, ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দ নিজ নিজ ভাবানুযায়ী এই কয়েকটি প্রশ্নেরই সমাধান করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একমাত্র প্রখর-মস্তিষ্কসম্পন্ন গিরিশচন্দ্রই দর্শনশাস্ত্রের মূলীভূত জটিল প্রশ্নসমূহ এইরূপ সহজ সরল ভাষায় একত্রিত করিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত নর-নারীর বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন।

"সিদ্ধার্থ" তপে সিদ্ধ হইয়া প্রথম উচ্চারণ করিলেন:—

কি দেখি! কি দেখি!
জলবিম্ব প্রায় কত শত বিশ্ব ভাসে
অসীম অনন্ত স্থানে,—
উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর ক্রমে!
কে করে গণন.
ঘূর্ণ্যমান কত শত বিশাল ভুবন—
রক্ষার কারণ
কিরণ-শরীরী ফেরে দেবদূতগণ।
ভিন্ন লোক, কিন্তু এক নিয়ম অধীন,
বিচিত্র নিয়ম।
ফোটে আলো আঁধার হইতে;
অচেতন সচেতন ক্রমে,
স্থূল শূন্যেতে মিশায়,
শূন্য পুনঃ স্থূল প্রসবিনী;
মৃত সঞ্জীবিত,
জীবন-মরণ করে গ্রাস;
মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে।—

নিয়ত এ শক্তি বহে হ্রাস-বৃদ্ধিহীন।
(যোগবলে শূন্যে উত্থান)
জনম বর্দ্ধন মৃত্যু—অবস্থা কেবল ;
দ্বেষ বা প্রণয়,
আনন্দ, যন্ত্রণা—মানসিক অবস্থার ভেদ।
যত দিন না ফোটে নয়ন,
মায়াবোধ যত দিন না হয় এ সব,
তদবধি নাহি যায় দুঃখ সুখ-ভোগ।
অবিদ্যাজনিত— ছল যেইজন জানে,
টুটে তার জীবন-মমতা ;
মায়ার ছলনে হয় সংস্কার উদয়,
পঞ্চভূত হ'য়ে সম্মিলন
জীব-জ্ঞান করিছে সৃজন,—
জীব-জ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব,
বেদনা সন্তান তার।

ইহা এক দার্শনিক ভাব। কি করিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আসিতেছে এবং ব্যক্ত কি করিয়া অব্যক্তে যাইতেছে. ইহাই হইল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অঙ্গ। এই অংশ-সকল কেবলমাত্র দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের জন্য প্রদত্ত হইতেছে ; তাঁহারা যেন এই সকল বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করেন।

"বিল্বমঙ্গল" নাটকে পাগলিনী বলিতেছে :—

চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়-করা ভক্ত-মনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।

... ...
কভু একাকার, নাহি আর কালের গমন ;
নাহি হিল্লোল-কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়,
নাহি—নাহি—ফুরাইল বাক্ ;
বর্ত্তমান বিরাজিত।

ইহাও একটি সুন্দর দার্শনিক ভাব। "নাহি হিল্লোল-কল্লোল" মানে, মন ঊর্দ্ধদিকে বা উচ্চস্তরে উঠিলে স্পন্দন, প্রকম্পন বা Vibration বলিয়া কিছুই থাকে না। "কালের হিল্লোল" অর্থাৎ কাল বা Time তাহারও কোন প্রকম্পন থাকে না। "স্থির—স্থির সমুদয়" অর্থাৎ সাম্যভাব বা নিস্পন্দ অবস্থায় মন উঠিতে পারে। "নাহি—নাহি—ফুরাইল বাক্," মনের এই অবস্থাতে সাধক বাক্শক্তিহীন হয় ; কারণ, কিছু আছে এ কথাও প্রকাশ করিতে পারে না, এবং কিছু যে নাই সে কথাও বলিতে পারে না—অস্তি নাস্তি বিবর্জ্জিতঃ। সেইজন্য কবি বলিলেন,—"ফুরাইল বাক্।" তবে রহিল কি ? "বর্ত্তমান বিরাজিত" অর্থাৎ অতীত বলিয়া কিছুই থাকে না, ভবিষ্যৎ বলিয়াও তখন কিছুই থাকে না, সমস্তই একীভূত হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদের ইহাই হইল চরম অবস্থা ; অদ্বৈতবাদ নানা তর্কযুক্তি দিয়া এই কয়েকটি কথাকেই বিকাশ ও সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কয়েকটি কথা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করা আর সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করা একই বস্তু। মানবমাত্রেই কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী। সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার কি ফল লাভ হয় ? তদুত্তরে গিরিশচন্দ্র সোমগিরির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "বৎস, কৃষ্ণ-

দর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন, আর অন্য ফল নাই," অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হইলে সমস্ত আকাঙ্ক্ষারই পরিসমাপ্তি হয়। সেইজন্য কবি বলিলেন, "কৃষ্ণদর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন"।

আর এক স্থানে আছে :—

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা ;
জয় গোবর্দ্ধন, চেতন-শিলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
চেতন-যমুনা চেতন-রেণু,
গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
খেলা, খেলা, খেলা, মেলা,
নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

"চেতন-যমুনা চেতন-রেণু" মানে সমস্তই চৈতন্যময়,—সমস্তই জীবন্ত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে হইল, "চিন্ময়শ্যাম, চিন্ময়নাম, চিন্ময়ধাম (অর্থাৎ ব্রহ্মন্ চিন্ময়)। নাম-রূপ যাহার আছে তাহাই চিন্ময়। চিন্ময়ধাম অর্থাৎ সৃষ্টি-জগৎ তাহাও চিন্ময়। গিরিশচন্দ্র সেই ভাবটি স্বল্পকথায় বলিলেন, "জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা ; জয় গোবর্দ্ধন, চেতন-শিলা।"

"চৈতন্যলীলা" নাটকে নিমাই বলিতেছেন :—

অনন্তশয্যায় মগ্ন একার্ণব-মাঝে,
যোগমায়া বলে, পদ-সেবা ছলে,
ব'সে লক্ষ্মী পদতলে ;
কে করে নির্ণয়—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
কোটী কোটী হইতেছে মুহূর্ত্তেকে ;

মায়ায় স্থজন, মায়ায় পালন,
মায়ায় নিধন পুনঃ।
এক—বহু, মায়া আবরণে ;
... ...
বাসনায় জগৎ স্থজন,
কর জীব বাসনা-বর্জ্জন,
নিত্যধন পাবে অনায়াসে ;
বাসনায় মনের জনম,
মন স্থষ্টি করে এ শরীর।
অনন্ত-বাসনা উঠে তায়,
ভাসে মন বাসনা-সাগরে।
মোহ অন্ধকারে আপনা পাশরে,
শিব ভুলি হয় জীব। ইত্যাদি—

"অশোক" নাটকে কুণাল বলিতেছেন :—

অন্তরের ফুলরাজি দেখ নাই ধ্যানে,
তাই তব নশ্বর কুসুমে অনুরাগ।
প্রকৃতির শোভা যা নেহার,
অস্ফুট অন্তর-ছবিমাত্র সে সুষমা ;
নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, রসনা
কিংবা স্পর্শেন্দ্রিয়—
অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অনুভব।
পঞ্চ সুখ একত্র মিলিত,
বর্দ্ধিত সহস্র গুণে—
সমাধিস্থ পুরুষের হয় উপভোগ।

"কালাপাহাড়" নাটকে চিন্তামণি বলিতেছেন ;—

অভিমান কর পরিহার, চূর্ণ কর
বল্ অবিদ্যা। জেনো সার, অহংকার—

নরক দুস্তর। শক্তি কার? মূলাধার
ভগবান্– শক্তির আকর; ভাবে মুগ্ধ
নর শক্তিধর আপনারে; জলধরে
জল, জল নহে প্রণালীর; জেনো স্থির,
শক্তি সেইমত। অনিবার্য্য, ফলে কার্য্য
ঈশ্বর ইচ্ছায়, হয় মানব নিচয়
ফলভোগী তার—কর্ত্তাজ্ঞানে আপনায়।
'অহম্ অহম্' ত্যজ বিচক্ষণ! জপ—
'তুঁহু তুঁহু' 'নাহম্ নাহম্'; পাশমুক্ত
হবে, হৃদ্‌পদ্মে বসিবেন শান্তিদেবী।
আ মলো! লোক শিক্ষা দিতে এসেছে,
অহংকার ছেড়েছ! দেখ্‌ছো ভাই, অহং-
কারের ফের? ও কি ছাড়ে! 'নাহম্ নাহম্—
তুঁহুঁ তুঁহুঁ তুঁহুঁ'।

"কালাপাহাড়" নাটকে নবাব সলিমান ও চিন্তামণির কথোপকথনে আছে:—

সলিম—তোম্ কোন্?

চিন্তামণি—আমি? কোন্ আমি? কাঁচা আমি, না পাকা আমি?

সলিম—কাঁচা পাকা কেয়া?

চিন্তা—কাঁচা আমি কি জান? আমার গৌড়ে জন্ম,—বামুনদের বাড়ী; নাম কালীকৃষ্ণ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, যা পাই তাই খাই, যেখানে কেও কিছু না বলে—প'ড়ে থাকি; আর পাকা আমি কি জান? তাঁর দাস আমি, তাঁর অংশ আমি। আর বল্‌তে পার্ব্বো না, তা হলে হুঁস থাকবে না।

সলিম—তুমি মোসাফের?

চিন্তা—এখন আর কিছুই ঠাওর পাচ্ছিনি। হারিয়ে গেছি, গুলিয়ে গেছি। দেখ্‌ছি সব সেই। তুমি দেখ—দেখ, অবাক কারখানা!

... ...

সলিম—মোসাফের! তুমি কি বল আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

চিন্তা—বুঝ্‌বে কি করে ভাই! বোঝ্‌বার যো নেই। নুনের পুতুল জলে নাম্‌লেই গ'লে যায়। মনের ভিরকুটী—বুঝেছ কি না? তোমার আমার কাছে ফক্ ফক্ করে, এদিক উদিক ঘুরে বেড়ায়,—চান্‌কি ক'রে বেড়ায়! আমি ত ফুস্‌লে ফাস্‌লে একদিন জিজ্ঞেস্ করেছিলেম্, বলি মন, তুই তো কত জায়গায় বেড়াস্, ব'লতে পারিস্, এ সব কি? তা ভাই, তুমিও যেমন।—হুঁ, মুরোদ ভারি!

সলিম—কেয়া? কেয়া?

চিন্তা—আর কেয়া! খানিক বুদ্ধি নিয়ে নাড়া-চাড়া কর্‌লে, তার পর আর সাত চড়ে কথা কয় কে! আমি সেই দিন থেকে মনের কেরামতি বুঝলেম্। ইত্যাদি—

"শঙ্করাচার্য্য" নাটকে শঙ্কর বলিতেছেন:—

বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহা বাক্যত্রয়ে
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য স্বপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।
এই মহা সত্যের আভাস
যে মুহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সংশয়াঃ'—
হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায়।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক প্রভাবে
আলোকিত হয় হৃদিস্থল।
তর্ক যুক্তি দার্শনিক মীমাংসা সকল
স্থান নাহি পায়,
এক জ্ঞানে বহু জ্ঞানক্ষয়।

এই সকল হইল অতীব জটিল, গভীর, গূঢ় দার্শনিক ভাব। এই সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বহুবৎসর চিন্তা করা আবশ্যক—এ সকল গান ও গল্প শুনিবার বিষয় নহে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রধান কয়েকটি মূলকথা এগুলিতে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিভাব বহু গ্রন্থেই প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, বিল্বমঙ্গল, রূপসনাতন, জনা, প্রভাসযজ্ঞ, পাণ্ডবগৌরব, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, নসীরাম, কালাপাহাড় প্রভৃতি নাটকের ভিতর দিয়া তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তিভাব ছিল তাহাই স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তিনি বৈষ্ণববংশীয় লোক, সেইজন্য বৈষ্ণবশাস্ত্র ও তাহার আচারপদ্ধতি শৈশব হইতেই তাঁহার বিশেষ জানা ছিল। গ্রন্থরচনাকালে তাঁহার শৈশবের ভক্তিভাব অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে প্রকৃত ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় বা মতান্তর নাই। তিনি নিষ্ক্রিয়-ভক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সরল, অকপট ও দৃঢ়বিশ্বাসী, এই হইল তাঁহার ভিতরকার ভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ভক্তি নিষ্ক্রিয়

ছিল না। নিস্তেজ নিষ্ক্রিয় মুমূর্ষুভাবাপন্ন ভক্তিবাদের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না; সক্রিয় তেজঃপূর্ণ ভক্তিই ছিল তাঁহার অন্তরের একান্ত অভিপ্রেত বস্তু। সেইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে "বীরভক্ত" বলিয়া আদর করিতেন। তাঁহার কাব্যের ভিতর যেখানে ভক্তিভাবের কথা উঠিয়াছে সেইখানেই তেজঃপূর্ণ ভাব পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণের নিকট ভক্তি অর্থে উৎসাহহীন নিস্তেজ হতাশভাব। কিন্তু গিরিশচন্দ্র নাটকের ভিতর দিয়া উৎসাহী, সতত কর্ম্মতৎপর সক্রিয় তেজঃপূর্ণ ভক্তি দর্শাইয়া গিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার কাব্যে ভক্তিরও একটু পার্থক্য ও বিশেষত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ "জনা" নাটকে তিনি জনার মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন :—

হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে প্রণয় বা অনুরাগ দর্শাইতে হইলে কাব্যে বহুপ্রকার উপায় কবিরা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিশোর-কিশোরীর মধ্যে কিরূপে সম্মিলন হয়, পরস্পরের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ কি প্রকারে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং শেষে পরস্পরে কি উপায়ে সম্মিলিত হয়, ইহা দেখান কাব্যের একটি বিশেষ অঙ্গ।

প্রথম শ্রেণীর আসক্তি হইল দর্শন ও প্রণয় অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকা পরস্পরে অতর্কিতভাবে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে এবং তাহাদের উভয়ের প্রাণ যেন দৃষ্টিপথ অবলম্বন করিয়া একে অন্যের (দুই জনেরই) ভিতর প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। দৃষ্টিপথ দিয়া প্রাণ বা অন্তরশক্তি প্রবাহিত হইয়া অপরের দৃষ্টিপথ দিয়া তাহার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ

করে এবং তথায় অবস্থান করিয়া এক দেহে দুই সত্তা—কভু দেখে এক সত্তা—এবং পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, মমতা ও নিজবস্তু-জ্ঞান এইরূপে অঙ্কুরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাতে ভাষণ বা অঙ্গসঞ্চালনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। মর্ম্মর প্রতীকের ন্যায় পরস্পরে পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করে ও তাহাতেই আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়ে—যেন পূর্ব্বজন্মের নিজবস্তু সহসা পাইয়া থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহাকে চকিত-দর্শন বলে। এই চকিত-দর্শন হইতেই অনুরাগ জন্মে এবং পুনরায় দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহাকে চঞ্চল-দর্শন কহে এবং সেই ভাব গাঢ় রূপে পর্য্যবসিত হইলে তাহাকে স্থির-দর্শন কহে। ইহা বাহ্যিকও হইতে পারে, আভ্যন্তরিকও হইতে পারে; কিন্তু বাহ্যিক হইল গৌণ, আভ্যন্তরিক হইল মুখ্য। এস্থলে দেহজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ চিৎশক্তি বা আত্মনকে পাইবার বা গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টা হয়। নায়ক বা নায়িকা যেস্থলেই থাকুক না কেন, যে কর্ম্মেই ব্যাপৃত হউক না কেন, হৃদয়মধ্যে যেন অপরের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। (মুখে কোন কথা নাই, অঙ্গ-সঞ্চালন নাই, অথচ স্থির, ধীর ও গম্ভীর হইয়া অপরের প্রতীক-দর্শন করিতেছে।) এই সময় নায়ক-নায়িকা সংযত-ভাষী, বিচ্ছিন্ন, এবং পূর্ব্ববন্ধু ও সমাজ হইতে বহু পরিমাণে পৃথক্ হইয়া পড়ে—একান্তে নিভৃতে বসিয়া নিজ অন্তরস্থিত ধ্যেয়বস্তু গভীরভাবে চিন্তা করে। এই জন্য সমবয়স্ক সঙ্গীরা অনেক বিদ্রূপ করিয়া থাকে। (ইহাকে ইংরাজীতে "Love at first sight" বলে।) ইহা হইল নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রণয় দেখাইবার এক প্রথা।

অপর এক প্রথা হইল পূর্ব্বাভাষ। ইহা দেহজ্ঞানে নয় বা পরোক্ষভাবেও নয়, কিন্তু স্বপ্নযোগে নিদ্রিত অবস্থায় কোন নায়ক নায়িকার রূপ দর্শন করিয়াছে এবং উভয়ের প্রাণ যেন এক হইয়াছে এবং উভয়ে পরম আত্মীয়—একবৃন্তে দুই পুষ্প—হইয়া যেন জীবন অতিবাহিত করিতেছে। এই স্বপ্নদৃষ্ট ঈপ্সিত ব্যক্তির জন্য নায়ক বা নায়িকা কয়েক বৎসর অন্বেষণ করে—অনেক ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করে, কিন্তু ঈপ্সিত বা স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির অনুরূপ না হওয়ায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ঈপ্সিত ব্যক্তির অনুসরণ করে। পরিশেষে দর্শন হইলেই বাসনার পরিসমাপ্তি হয়।) এই স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি নিদ্রাকালেও আবির্ভূত হইতে পারে; জাগ্রত অবস্থায়ও হইতে পারে। ইহার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, পূর্ব্বজন্মে দুই আত্মা এক ছিল; এই জন্মে দুই আত্মা দুই দেহ ধারণ করিয়া দুই দেহে ছিল এবং পরস্পরে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্য ইহাকে আভাষ বা অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর জন্য চেষ্টা, এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এবং এই কারণে ইহাকে পূর্ব্বাভাষ কহে।/

তৃতীয় প্রকার হইল পূর্ব্বরাগ। ইহা হইল কোন ব্যক্তির গুণবর্ণনা, সঙ্গীত বা প্রসঙ্গ কর্ণে যাওয়ায়, অন্তর হইতে শ্রুত ব্যক্তির প্রসঙ্গ পুঞ্জীভূত হইয়া তাহার হৃদয়-মধ্যে এক রূপের বা অবয়বের আকৃতি সৃষ্টি করে—সেই আকৃতি বা গুণবিশিষ্ট প্রতীকের অন্বেষণ চেষ্টা করে। কখন-বা এরূপ হয় যে ঘটনাক্রমে সহসা এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াছে, তাহাতেই নিজের অন্তরাত্মা সেই ব্যক্তির প্রতি অনুধাবিত হইল। "রোমিও জুলিয়েট্" নাটকে জুলিয়েট্ বলিতেছে,

"My ears have not drunk hundred words of that tongue's utterance, yet I know the voice." তাহার পর মিলন হইবার নানা প্রয়াস হইয়া থাকে; ইহাকে পূর্ব্বরাগ বলে।[7] বৈষ্ণবশাস্ত্রে পূর্ব্বাভাষ ও পূর্ব্বরাগের বহু বর্ণনা আছে। "নলদময়ন্তী" নাটকে দময়ন্তী প্রমোদকাননে হংসের মুখে নলের উপাখ্যান শুনিয়া অন্যবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। সখিগণ দময়ন্তীর এই ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া অনেক প্রকার বিদ্রূপ ও পরিহাস করিতে লাগিল। এই উপাখ্যান পূর্ব্বরাগের একটি বিশেষ উদাহরণ।

ইহাই হইল প্রাচীন প্রথানুযায়ী তিন প্রকার মিলন-পন্থা।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ এসিয়ার সমাজ হইতে পৃথক্। এইজন্য এতদ্দেশে অন্য প্রকার বর্ণনাকৌশল প্রযুক্ত হইয়াছে। এক শ্রেণীর হইল প্রাগ্-উদ্বাহ মিলন। ইহা গ্রাম্য চাষাদিগের ভিতর দেখিতে বড় সুন্দর হয়। একই গ্রামের চাষা ও চাষারমণী ক্ষেতে গম কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া রাখিয়া খড়ের গাদার পার্শ্বে বসিয়া দুইটিতে পরস্পরের সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতেছে। ইহাকে বলে প্রাগ্-উদ্বাহ মিলন, অর্থাৎ উদ্বাহ হয় নাই কিন্তু পরস্পরের সহিত মিলন হইয়াছে। ইহা ইউরোপীয় সমাজে চলিতে পারে কিন্তু এসিয়ার সমাজে চলিতে পারে না; অর্থাৎ এসিয়ার সমাজে এইরূপ প্রথা এখনও চলে নাই, তবে বিরল দুই একটির কথা বলা যাইতে পারে। ইহাকে ইংরাজীতে Pre-nuptial Love বলে।

উদ্বাহ-নির্দ্ধারণ বা Engagementএ অপর এক প্রকার অনুরাগ দর্শন করান হয়। উভয়ের মধ্যে উদ্বাহ-নির্দ্ধারণ হইয়াছে কিন্তু যাজকের কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই; এইজন্য

উভয়েই অবসর মত পরস্পরে মিলিত হইয়া কথোপকথন, একত্রে বিচরণ ও সুরম্যস্থানসমূহ দর্শন করিতে যায়। ইহাও এক প্রকার অনুরাগ দর্শাইবার প্রথা। এইরূপ বহুপ্রকার রচনা-পদ্ধতি-কৌশল দিয়া নায়ক নায়িকার মনোবৃত্তি ও সমাজের প্রচলিত ভাব কাব্যে পরিদর্শন করান হয়। প্রথম কয়েকটি হইল চিরন্তন শাশ্বত প্রথা; অপর দুইটি হইল সামাজিক প্রথা। কিন্তু সামাজিক প্রথা হইলেও চিরন্তন প্রথা অন্তর-নিহিত থাকে; এইজন্য নায়ক-নায়িকা বহু ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক বিশিষ্টকেন্দ্রে চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া থাকে।

এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বরাগ লইয়া কোন বিশিষ্ট নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন কি না। যতদূর লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে গিরিশচন্দ্রকে পূর্ব্বরাগকে মুখ্য করিয়া কোন নাটক রচনা করিতে দেখিতে পাই না। পূর্ব্বরাগ বা Pre-nuptial Love লইয়া গিরিশচন্দ্র কোন বিশিষ্ট নাটক রচনা করেন নাই।

ইহা হইল ইউরোপীয় ভাব; বর্ত্তমানে ভারতীয় সমাজ-শরীরে ইহা অল্পবিস্তর প্রবেশ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র প্রবীণ লোক, সমাজে গণ্যমান্য কর্ত্তাব্যক্তি ছিলেন। পুরাতন সমাজ-বিন্যাস সহসা পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না, এবং তিনি ইহা পছন্দও করিতেন না; সেইজন্য বিবাহের পূর্ব্বরাগ তিনি নাটকের ভিতর বড় একটা দেখান নাই। কিন্তু বিবাহের পররাগ বা দাম্পত্য-প্রণয় যাহা সমাজকে দৃঢ়ীভূত করিয়া রাখে তাহা তিনি বহুল পরিমাণে, নানান্ প্রকারে দর্শাইয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সমাজের প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক শ্রদ্ধা

ছিল, ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি সমাজের অনেক বিষয় পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু ঘর-সংসারের দাম্পত্যপ্রণয় পরিবর্ত্তন করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না।

সঙ্গীত-রচনা-বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ শক্তি ছিল। ধীরভাবে চিন্তা করিলে স্বতঃই একটি প্রশ্ন উঠে যে, তাঁহার নাটকের ভিতর অভিনেয় অংশের প্রাধান্য না সঙ্গীতের মুখ্যত্ব? কাব্যের ভিতর কথোপকথন উপলক্ষে যতপ্রকার ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, সেই সকল ভাব সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তিনি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছেন ঘটনার সারাংশ হইল সঙ্গীত। তাঁহার সঙ্গীতে একটি বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অতীতে যে সকল ভাব বর্ণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল ভাব প্রকাশ পাইবে এই উভয় ধারার সংযোগ-কেন্দ্র তিনি সঙ্গীত দিয়া প্রকাশ করিতেন—ভবিষ্যভাবের উদ্‌বোধক রূপের সূচনা করিয়া দিতেন। ইহা সত্য যে, সঙ্গীতগুলি স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিলে তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়; কিন্তু সংশ্লিষ্টভাবে পাঠ করিলে অর্থাৎ যে স্থলে সঙ্গীতটি সন্নিবেশিত হইয়াছে সেই স্থানে পড়িলে তাহার অতি গভীর অর্থ বুঝা যায়—ঠিক যেন কোন অশরীরী বাণী অলক্ষিতে পূর্ব্ব ঘটনা ও পরবর্ত্তী ঘটনার কি সংশ্লিষ্টভাব, কি প্রগতি ও কি পরিণতি হইবে তাহাই যেন সূচনা করিয়া দেয়। এইজন্য সঙ্গীতগুলি কাব্যের যথাস্থানে পাঠ করিলে তাহার ভিতর গভীরভাব উপলব্ধি হয়। কাব্যের মনস্তাত্ত্বিক ভাব কি, দার্শনিক ভাব কি, এবং গূঢ় অর্থ কি, তাহাই তিনি সঙ্গীত দিয়া প্রকাশ করিতেন। চরিত্রের কথোপকথনে অনেক ভাব দেখান হইয়াছে, অনেক শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে এবং অনেক

সময়ও লাগিয়াছে, কিন্তু তিনি এই তিন উপাদানকে একত্রে সংক্ষেপ করিয়া অল্প ভাষায় সঙ্গীত রচনা করিতেন এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টি কোন্ দিকে চলিবে তাহার একটি বীথিকা উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেন। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গীতের ভিতর মনস্তত্ত্বের ভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়—সাধারণভাবে পাঠ করিলে এক অর্থ প্রকাশ পায়, মনস্তত্ত্ব দিয়া পাঠ করিলে অন্য অর্থ নির্ণয় হয়।

সাধারণ সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাব অপেক্ষা ভাষার ঘনঘটা অত্যধিক ; সেই সমস্ত সঙ্গীতে কেবল ভাষার মাধুর্য্য দেখাইবার প্রচেষ্টা হয়, সেইজন্য সঙ্গীতের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ হয় না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীত-রচনা অন্য প্রকৃতির; অল্প কথার দ্বারা বিরাট্ ভাব প্রকাশ করাই হইল তাঁহার সঙ্গীতের বিশেষত্ব। শুধু ইহাই তাঁহার সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নহে ; গ্রাম্য শব্দ, প্রচলিত শব্দ, স্ত্রীলোকদিগের ভাষা এবং সমাজের নানান্ শ্রেণীর শব্দ ও ভাষা দিয়া স্থানবিশেষের ভাব-বিকাশক সঙ্গীত-রচনাতে তিনি অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ বিল্বমঙ্গলের ভিক্ষুকের প্রথম সঙ্গীতটি উল্লেখ করিতেছি :—

ওঠা নামা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে,
কোথায় নে যায়, কে জানে ?
কোথায় বিষম ঘুরণ পাক,
চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে,
ছনিয়া দেখে ফাঁক্।
কোথাও তর্‌তরে ধায়,
ভাসিয়ে নে যায়,
টান পড়েছে কি টানে॥

উপরোক্ত সঙ্গীতটিও যা, সমস্ত কাব্যখানিও তাহাই ; এই সঙ্গীতে গিরিশচন্দ্র গ্রাম্য বা প্রচলিত ভাষা দ্বারা বিপুল ভাবরাশি প্রকাশ করিয়াছেন ; যথা—

চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে,
দুনিয়া দেখে ফাঁক।

আর একটি সঙ্গীত হইতেছে—

বসে ছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, খামকা উঠে,
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে ॥
সাঁঝে সকালে ফেরে চালে চালে,
আহা! পগার পারে বঁধু যেতে এগোনে ॥

ইহাও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ দ্বারা সঙ্গীত রচনার একটি বিশেষ নিদর্শন। ইহা ব্যতীত বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর গান, বুদ্ধদেব-চরিত্রের গান, চৈতন্যলীলার গান, জনার গান, তপোবলের গান, বলিদানের গান, শাস্তি কি শান্তির গান, আবুহোসেনের গান, অশোকের গান, পাণ্ডবগৌরবের গান, নসীরামের গান, ইত্যাদি তাঁহার নাটকে সঙ্গীত-রচনার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। সমুদ্রসম তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বভাবের সঙ্গীত তাঁহার রচনার ভিতর পরিলক্ষিত হয়। তিনি সঙ্গীত-দ্বারা ভাবরাশিকে চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টরূপে দর্শাইতে পারিতেন—ভাবগুলি যেন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বা বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আবুহোসেনের সঙ্গীতগুলি বয়স, অবস্থা, ও মনের সঠিকভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইজন্য এই সকল সঙ্গীতকে মনস্তত্ত্বের সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীতগুলিকে বহু অংশে বিভক্ত করা

যাইতে পারে। তাঁহার সঙ্গীতের ভিতর কোথাও ভক্তিভাব, কোথাও বৈরাগ্যভাব, কোথাও নির্ভরের ভাব, এবং যথায় আবশ্যক হইয়াছে তথায় চাপল্যের ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।/ ইহা ব্যতীত দার্শনিক সঙ্গীত রচনাতে তিনি বহু জটিল প্রশ্ন সরল ও সরসভাবে সমাধান করিয়াছেন। সমসাময়িক ঘটনা লইয়াও তিনি হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়া চিত্তাকর্ষক বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ দুই একটি সঙ্গীত এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। লর্ড ডাফ্‌রিনের সময় "খোলা-ভাটি"র প্রথা খুব চলিয়াছিল; উহা উপলক্ষ্য করিয়া গিরিশচন্দ্র সঙ্গীত রচনা করিলেন :—

রাণী মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে, পয়সা নেবে না।
ঠোঙ্গা করে শালপাতাতে,
চাট্‌ দেবে হাতে হাতে,
তেল মাখা মটর ভাজা, মোলাম বেদানা।

ইত্যাদি

খোলা-ভাটির আন্দোলনের ব্যাপার এখন বড় একটা আর কাহারও মনে নাই, কিন্তু যাঁহারা সেই আন্দোলনের কথা জানেন তাঁহারা এই সঙ্গীতের হৃদ্‌গত মনোভাব বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ইহা অতীত ঘটনাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

লর্ড কার্জ্জনের সময় চা-পান লইয়া আন্দোলন হয়। চা-পান বহুল-প্রচলনের উদ্দেশ্যে নানা পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

ইহাকে লক্ষ্য করিয়া গিরিশচন্দ্র "আয়না" নাটকে সঙ্গীত রচনা করিলেন :—

পু ।—সাহেবেরা দেখ্‌লে ভেবে,
বাঙ্গালা বরবাদে যাবে—
গরম গরম চা না খেলে ।
স্ত্রী ।—জেনানা চা পায় না খেতে,
মেম কাঁদে তাই হুকুর রেতে,
বলে পুয়োর জেনানা বাঁচ্‌বে কিসে
চা না পেলে । ইত্যাদি—

ইংরাজী কাব্যে উদ্বোধন ও সমাপ্তি নামে দুই আখ্যায়িকা সন্নিবেশিত করা হয়; ইহা প্রাচীন প্রথা এবং বহু কাব্যে এইরূপ রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্রও স্থান-বিশেষে এই প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন। (তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি প্রথমে একটি সঙ্গীত দিয়া গ্রন্থের উদ্বোধন করিলেন এবং সমাপ্তিতে আর একটি সঙ্গীত দিয়া গ্রন্থটির পরিসমাপ্তি করিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে ইহাকে Prologue ও Epilogue বলিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমরা "বিল্বমঙ্গল" ও "জনা" নাটকের উল্লেখ করিতেছি। "বিল্বমঙ্গল" নাটকে প্রথম একটি সঙ্গীত দিয়া নাটকের ভবিষ্যতে কি বলা হইবে তাহার সূচনা করিয়া দেওয়া হইল—সেই সঙ্গীতের ভাবার্থ নাটকে নানা রূপে পরিদর্শিত হইয়াছে। সঙ্গীতের ভাবটি স্ফুরণ করিলে নাটকে বর্ণিত ভাবরাশি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ, সমাপ্তিতেও একটি সঙ্গীত দিয়া পরিণতি ও সমাপ্তি কিরূপ হইল তাহাই দেখান হইয়াছে। এই পরিসমাপ্তি-সঙ্গীতটিতে কাব্যের ভিতরকার সমস্ত ভাবপুঞ্জ

প্রধাবিত হইয়া কোন্ স্থানে উপনীত হইল তাহাই তিনি দেখাইয়াছেন। এই সকল হইল কাব্যের ভিতর দার্শনিক ভাবের পরিণতি। তিনি অতি কোবিদ ও নদিষ্টের ন্যায় এই সকল দার্শনিক ভাব স্তরে স্তরে পরিবর্দ্ধিত পরিণতিতে আনিয়া পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। ইহাই হইল গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব।)

পূর্ব্বে কাব্য-রচনার উপাদান-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কেবলমাত্র উপাদান আলোচনা করিলেই কাব্য-রচনায় কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। উপাদানের অতিরিক্ত অন্য এক বস্তু আছে যাহাকে নিজস্ব স্বভাব-সুলভ শক্তি বলা হয়। ধীশক্তি ও প্রতিভা হইল স্বভাব-জাত। ইহা গ্রন্থ পড়িলেও হয় না, অনুকরণ করিলেও হয় না। গিরিশচন্দ্রের এই ধীশক্তি ও প্রতিভা থাকায় তিনি কাব্য-রচনায় এতদূর কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা কাব্য-রচনার নিয়মাবলী সচরাচর পালন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আবশ্যক হইলে প্রচলিত নিয়মাবলী অতিক্রম করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন না। এইস্থলে দেখা যাইতেছে যে, গিরিশচন্দ্রের কি অদ্ভুত ধীশক্তি ও প্রতিভা ছিল। তিনি সামান্য একটি গল্প গ্রহণ করিতেন যাহা নিয়ত সাংসারিক জীবনে ঘটিতেছে। সচরাচরযে সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা জনসাধারণের মনোমধ্যে রেখাপাত করে না, কারণ ইহা দৈনন্দিন ঘটনাবিশেষ। গিরিশচন্দ্র এইরূপ একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঘটনা সৃষ্টি করিয়া, অনুকূল-প্রতিকূল ভাব সৃষ্টি করিয়া, সহায়ক ও বিপরীত ভাব নানারূপে এবং তাহার পরিণতি কি হইবে সেই সকল অলক্ষিতে তর্ক-যুক্তি দিয়া

নির্দ্ধারণ করিয়া এমন এক বিরাট্ ব্যাপার সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন যে, লোকে শুনিয়া বিমুগ্ধ ও বিমূঢ় হইয়া পড়ে—চলিত কথায় যাহাকে বলে তিলকে তাল করিয়া তোলা; এমন এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার সৃজন করিলেন যে সেই বিষয়-বস্তু শুনিতে সকলেরই প্রবল আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জন্মাইল। নায়ক কখন কি বলিবে, বিভিন্ন চরিত্র-সকল কি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবে এবং তারপর কি হইবে, সেই সকল ঘটনা জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া রহিল। বিষয়বস্তুটি এমনই রূপ ধারণ করিল যে, যেন তাহার বিষয় না জানিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এবং সৃষ্টিও হয়তো রসাতলে যাইবে। এইরূপে তিনি রস-সৃষ্টির দ্বারা শ্রোতার মনকে আলোড়িত ও অভিভূত করিয়া ফেলিতেন। ইহাই হইল তাঁহার কবিত্ব-শক্তি, ইহাই হইল তাঁহার ধীশক্তি।

উদাহরণস্বরূপ "প্রফুল্ল" নাটকের নাম উল্লেখ করিতেছি। যোগেশ একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। ঘটনাচক্রে দেউলিয়া হইয়া পড়েন। মদ্যপান করিয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন এবং অবশেষে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রও কষ্ট পাইল। এরূপ ঘটনা নিত্য সংসার-ক্ষেত্রে বহুলপরিমাণে ঘটিয়া থাকে, সেজন্য কাহারও বিশেষ মনোযোগ অকর্ষণ করে না। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট যোগেশ এক নূতন ব্যক্তি। তাহার হাব-ভাব, চাল-চলন জানিবার জন্য সকলেই বিশেষ উৎসুক ও আগ্রহান্বিত। জগতে যেন এরূপ প্রকৃতির লোক আর দুইটি হয় নাই। তাহার আনুষঙ্গিক ও পার্শ্বচরিত্র-সকল যেন নভঃস্থল হইতে পৃথ্বীতলে আবির্ভূত হইয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া গেল। এই

সকল ঘটনা স্বপ্নের ন্যায়ও বটে, আবার প্রকৃত ঘটনাও বটে। সত্য ও অলীক এক সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে, বাস্তব ও কাল্পনিক এক সাথে মিলিত হইয়াছে। ঠিক্ বটে, আবার ঠিক্ নাও বটে! এইটিই হইল গিরিশচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি, এইটি হইল তাঁহার কল্পনা-শক্তি। নিতান্ত কাল্পনিক অসত্যকেও তিনি এ জগতে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন; অথচ এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ বা তর্ক-যুক্তি করিতে সাহস করিতেছে না। ইহাই হইল গিরিশচন্দ্রের ধীশক্তি ও প্রতিভা, যাহা কাব্য-রচনার উপাদানের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

"চৈতন্যলীলা" নাটকের উপাখ্যান বাঙ্গালা দেশে সুপরিচিত। বাঙ্গালার নরনারীমাত্রেই—এমন কি শিশুরা পর্য্যন্ত—নিমাই, নিতাই, জগাই, মাধাই প্রভৃতির নাম ও কাহিনী জানে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা" অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব, নবদ্বীপের তৎকালীন ঘটনাসমূহ চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়—দর্শকের মনকে তাহার অজ্ঞাতসারে কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্বস্থানে লইয়া যাইয়া ঘটনানিচয়কে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দর্শন করায় ও অঙ্গীভূত করিয়া দেয়। কথকদের কথা বা বৃদ্ধদের শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক কাহিনী শোনা-কথা, গিরিশচন্দ্রের শ্রীচৈতন্যের কথা দেখা-কথা। ঘটনাকালীন ও গিরিশচন্দ্রের সময়ের মধ্যে যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান ছিল তাহা একেবারে বিলুপ্ত ও অন্তর্হিত করিয়া দিয়া প্রত্যেক ঘটনাটিকে প্রত্যক্ষদর্শী ও অঙ্গীভূত ব্যক্তির ন্যায় অর্থাৎ বর্ত্তমানে ঘটনাসমূহের ব্যক্তি-পুঞ্জেরে অন্যতম দ্রষ্টা ও কর্ম্মী করিয়া দেয়—যেন নিমাই পণ্ডিতের একজন পার্শ্বচর প্রত্যেক ঘটনা স্বয়ং দেখিতেছে ও করিতেছে, অথচ সমস্ত ঘটনাটি হইল গিরিশচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত

স্থষ্ট-বস্তু ; জনসাধারণ বুঝিতেই পারে না যে, একজন লোক কয়েক শতাব্দী পরে নিজের ঘরে বসিয়া কল্পনাতে অলীক কথাবার্ত্তা রচনা করিয়াছিল। কোথায়-বা নিমাই আর কোথায়ই-বা নবদ্বীপ ! কল্পনা, কবিত্ব-শক্তি ও প্রতিভা এমনই আশ্চর্য্য বস্তু যে, নিমাই পণ্ডিত, নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, শচী, জগাই, মাধাই প্রভৃতি সকলকে দ্রষ্টার সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছিল—দর্শকেরা যেন প্রত্যেক চরিত্রটি প্রাণবস্তুরূপে প্রত্যক্ষ করিল। ইহাও গিরিশ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, নাটকের উদ্দেশ্য কি ? বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে কি করিয়া সমাজে প্রগতি হইবে এবং সমাজের দুর্নীতি নিরাকরণ করিয়া দীপ্তিময়ভাব নানাস্তরে চলিবে, এই ভাবটি নানা চরিত্র ও উপাখ্যানের ভিতর দিয়া দেখানই হইল নাটকের উদ্দেশ্য।

"বিল্বমঙ্গল" নাটক তখন মাত্র দুই-তিন রাত্র অভিনয় হইয়াছে। স্বামী সারদানন্দ ও আমি বেলা ১১টার সময় গিরিশ-চন্দ্রের গৃহে গমন করি। কথা-প্রসঙ্গে সারদানন্দ গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "গিরিশবাবু, বিল্বমঙ্গল তো বৈরাগ্য করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কিছু দিন পরে আবার তার মনটা নেবে এলো কেন ? বৈরাগ্য একবার হলে মনটা কি করে আবার সংসারে ফিরে আস্‌বে।" গিরিশচন্দ্র তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "শরৎ, তোমার বয়স্ অল্প, জগৎটা কি ব্যাপার তা এখনও বোঝ নাই। বিল্বমঙ্গল একটা বকাটে ছোঁড়া, একটা বেশ্যার মুখঝাম্‌টানী খেয়ে রাগের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিছুদিন এদিক্ ওদিক্ কর্‌লে, খাওয়া-দাওয়া ও থাক্‌বার নানা কষ্ট বুঝ্‌তে পার্ল্লে—এমন

সময় রাগটা প'ড়ে গেল। সেই সময় পূর্ব্ব-সংস্কার, পূর্ব্ব-প্রবৃত্তি, পূর্ব্ব-অভ্যাস সহস্রগুণে প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠে। অধিকাংশ লোকই এই সময় বাড়ীতে ফিরে আসে, আবার ঘর-সংসার করে। এইটিই হ'ল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি কেউ এই সময়ে ভাগ্যক্রমে সদ্‌-গুরু পায়, সদ্‌-উপদেশ শোনে, তা'হলে তার জীবনের স্রোত অন্য দিকে যায়। এইজন্য নাটকের প্রথম ভাগে ভাবের তুফান এতো দেখিয়েছি—রাগের মাথায়, ঝোঁকের মাথায় বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে গেল, ইত্যাদি। সেটা কিন্তু আসল ও স্থায়ী বৈরাগ্য নয়; রাগ প'ড়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে সব মিটে যায়। প্রথম অবস্থায় মাত্র হৈ চৈ দেখিয়েছি, কত কথাবার্ত্তা ক'ইয়েছি। কিন্তু যখন সত্যই ভগবানের জন্য বৈরাগ্য হ'লো, ভগবান্‌ লাভের জন্য তার মনটা কেঁদে উঠলো, তখন আর মুখে কোন হৈ চৈ রইল না, মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল, ভেতরকার প্রাণটা তখন স্তরে স্তরে খুলতে লাগল। সেইটাই হ'লো আসল বৈরাগ্য; সেটা হ'লো ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা—ধীরে ধীরে, সব প্রাণে প্রাণে কথা! সত্যকারের সাধকের মন কিরূপ হয় তা'ই দেখান হয়েছে। এখন বুঝ্‌লে শরৎ, রাগের ঝোঁকে বেরিয়ে পড়া এক বৈরাগ্য, আর ভগবানের জন্য বেরিয়ে পড়া আর এক বৈরাগ্য। দুই-এর ভিতর ঢের পার্থক্য আছে!"

একদিন গিরিশচন্দ্র অতি শোকার্ত্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশাইয়ের নিকট গিয়া নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন। সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহাকে পরমহংস মশাই বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির উপাখ্যানটি বলিয়াছিলেন। গিরিশ-চন্দ্র সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর"

নাটক রচনা করেন। ইহা আমার শোনা কথা; তবে গিরিশচন্দ্রকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি যে, "সাধক" চরিত্রের বেশভূষা কিরূপ হইবে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা কি ভাবে থাকিবে, কিরূপভাবে হস্ত সঞ্চালন ও অঙ্গভঙ্গী করিবে ইত্যাদি—পরমহংস মশাই অতি নিখুঁতভাবে দর্শাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র অনেক সময় আমাদিগকে পরমহংস মশাইয়ের প্রদর্শিত হাব-ভাব অনুকরণ করিয়া সাধকের পালা দেখাইতেন। পাগলিনী চরিত্র লইয়াও একটি কিংবদন্তী চলিত আছে। আমার শোনা কথা যে, দক্ষিণেশ্বরে ঐরূপ প্রকৃতিসম্পন্না একটি স্ত্রীলোক আসিত, সেও ঐরূপ ওলট্-পালট্ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিত। গিরিশচন্দ্র পাগলিনার কথাগুলি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথও নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। সেই স্ত্রীলোকটিকে নব-কলেবরে গিরিশচন্দ্র তাহার "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" নাটকে পাগলিনীরূপে চিত্রণ করিয়াছেন।

"বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" একখানি বৈরাগ্যমূলক নাটক। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, অতি তুচ্ছ লোক, অতি বকাটে ছেলে, চোর, অতি-ঘৃণ্য জীব এবং পতিতাও যদি সরল প্রাণের মানুষ হয়, তাহা হইলে তাহারও মুক্তি হইবার আশা আছে; কিন্তু যদি বাহ্যিক আবরণ ভক্তভাবাপন্ন অথচ অন্তর কদর্য্যতাপূর্ণ হয় তাহা হইলে তাহার ভগবদ্-দর্শনের সম্ভবনা নাই। সেইজন্য বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও ভিক্ষুকের মুক্তি হইল, এবং সাধক ও থাকর অপমৃত্যু ঘটিল। এই কাব্যে গিরিশচন্দ্র সমাজ, দর্শন-শাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, ভক্তি ও কবিত্বশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিকাশ

করিয়াছেন। প্রত্যেক ছত্র, প্রত্যেক পংক্তিতে বিশেষ ভাব ও বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। বহু দিক দিয়া বহু ভাবে এই নাটকখানির অর্থ করা যাইতে পারে।

বণিক্ ও তাহার পত্নী অহল্যাকে লইয়া অনেকেই তর্ক-বিতর্ক করিয়া থাকেন। এই কাব্য যখন রচনা হইতেছিল ঠিক্ সেই সময় বোম্বাই প্রদেশে রুক্মাবাঈ-এর মোকর্দ্দমা আরম্ভ হয়। উক্ত ঘটনাটি অনেকটা এই ভাবাপন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় যখন কোন এক প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন উভয়েরই ঐরূপ বিপদের আশঙ্কা হইয়াছিল। অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া উভয়েই আহার ত্যাগ করিয়া সেই গৃহ হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। বাঙ্গালা দেশে এ সকল প্রথা আদৌ প্রচলন নাই বলিয়া অনেকের নিকট ঘটনাটি রুচিবিগর্হিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এইরূপ দেশাচার বা প্রথা বিদ্যমান আছে; তাঁহারা ইহা সৎকার্য্য ও পুণ্যকার্য্য বলিয়া অনুমোদন করেন। বণিক্ ও বণিক্-পত্নীর উপাখ্যানটি অতিরঞ্জিত বা নিছক কল্পনাপ্রসূত নহে। "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" নাটক একাধারে কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র। ইহাকে কাব্যও যেমন বলা হয় তেমনই উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রও বলা যাইতে পারে। ইহার গূঢ়মর্ম্ম অনুধাবন করিতে হইলে টীকা ও ভাষ্যের একান্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপে ইহার ব্যাখ্যা ও কবিত্বশক্তির বিষয় বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

নাটক প্রণয়ন করিবার প্রথা হইল, কোন একটি ঘটনার মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এমন একটি ঘটনা লইয়া আখ্যায়িকা প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা পূর্ব্ব-ঘটনা ও

পরবর্ত্তী ঘটনা উভয়েরই সংমিশ্রণ-ক্ষেত্র হইতে পারে—অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতে সংমিশ্রণ-ক্ষেত্র হইতে নাটকীয় ঘটনা আরম্ভ করিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, অতীতের ঘটনা সহজে বোধগম্য হয় এবং ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহাও বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। চিত্র অঙ্কনকালে শিল্পী যেমন বিষয়ের পরিদর্শন করাইতে চাহিলে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যস্থলের ঘটনা লইয়া প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন, তাহাতে যেমন অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সকল ঘটনা বুঝা যায়, কাব্যও ঠিক তদ্রূপ পন্থা অনুসরণ করে। ইহা না হইলে কাব্য নিস্তেজ ও নীরস হইয়া পড়ে। ইহা একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ফটোগ্রাফের উদ্দেশ্য হইল, বস্তুর প্রতিকৃতি পরিদর্শন করান—ইহা ব্যতীত অন্য কোন ভাব উদ্রেক করিতে পারে না। শিল্পী কিন্তু অন্য উপায় অবলম্বন করেন—তিনি বর্ণ ও রেখা দ্বারা এইরূপ প্রতিকৃতি দর্শাইয়া থাকেন, যাহাতে অজ্ঞাতসারে উচ্চ-ভাবের আবির্ভাব হয়। মনস্তত্ত্ব-প্রণোদিত হইয়াই মন উচ্চ-স্তরে চলিয়া যায়, এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব অজ্ঞাত লোকে বা স্থানে প্রধাবিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবরাশি অবলোকন করে ও তৎসহ মিশ্রিত হইয়া যায়। বর্ণ ও রেখা দ্বারা মনকে উচ্চস্তরে লইয়া যাওয়াতেই হইল শিল্পীর কৃতিত্ব। ফটোগ্রাফের কার্য্য হইল মৃতপ্রায় নিস্তেজ নীরস বস্তু প্রদর্শন করান, ইহার দ্বারা কোন উচ্চ-ভাব জাগ্রত হয় না।

নাটক রচনাতেও ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। যেমনটি দেখিয়াছি তেমনটি লিখিয়াছি, এই কথা উচ্চাঙ্গের নাটকে প্রযোজ্য হয় না। শুধু ইহা নহে, শিল্পের জন্যই শিল্প, এ কথাও উচ্চাঙ্গের নাটক বা কাব্যে প্রকৃষ্টরূপে প্রয়োগ হয় না

কারণ উচ্চাঙ্গের কাব্যে পরিণতি দেখাইতে হইবে। সমাজের উপর, জাতির উপর কিরূপ ভাবরাশি প্রতিভা বিস্তার করিবে. উল্লিখিত ভাবসমূহ সমাজের প্রতি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে এবং কোন্ পথে সমাজ ও জাতির মনকে লইয়া যাইবে, তাহাতে কিরূপ সুফল হওয়া সম্ভবপর এবং সমাজের দূষণীয় বিষয়বস্তু কি ভাবে বর্জ্জন করিতে হয়—কাব্যে এই সকল বিষয় অজ্ঞাতসারে বিকাশ করিবে। একজন প্রবীণ দার্শনিক সমাজ ও জাতির বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সমাজের দোষ সকল নিরাকরণ করা, সমাজের ভিতর নূতন প্রদীপ্তভাব জাগ্রত করা এবং ভবিষ্যতে সমাজ ও জাতির প্রগতি কোন্ দিকে ধাবিত হইবে তাহা প্রাণস্পর্শী ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই হইল শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদ্দেশ্য। দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক ও উপদেষ্টা এই তিন ভাবই একত্রে অলক্ষিতভাবে শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভিতর গ্রথিত থাকে। সেইজন্য কঠোর দর্শন-শাস্ত্রাপেক্ষা সরস কাব্য পড়িতে সকলে এত আগ্রহ প্রকাশ করে। এক্ষণে আলোচ্য বিষয় হইতেছে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে উক্ত ভাবসমূহ কতদূর পর্য্যন্ত দর্শাইতে পারিয়াছেন? গিরিশচন্দ্র সাধারণতঃ শিল্পের জন্যই শিল্প দর্শাইয়াছেন কিংবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা করিয়া সমাজ ও জাতির উন্নতিকল্পে নাটক রচনা করিয়াছিলেন—তিনি সাধারণ যাত্রার পালা বাঁধা কবিওয়ালা ছিলেন, কি একজন দার্শনিক, উপদেষ্টা ও গভীর চিন্তাশীল মহাকবি ছিলেন, ইহাই হইল এখনকার আলোচ্য বিষয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীকে বা কাব্যসমূহকে বহু অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—সামাজিক, ঐতিহাসিক,

পৌরাণিক, দেশাত্মবোধক, ভক্তি ও বৈরাগ্যমূলক, প্রহসন প্রভৃতি। সামাজিক নাটক তাঁহার অনেকগুলি আছে, তন্মধ্যে প্রফুল্ল, হারানিধি, বলিদান, শাস্তি কি শান্তি, মায়াবসান প্রভৃতি কয়েকটি মুখ্য-কাব্য। সমাজে কিরূপ দুর্নীতি আছে, গৃহের অভ্যন্তরে লোকের কিরূপ দুঃখ-কষ্ট হইয়া থাকে, নারীদিগের কি রকম শোচনীয় অবস্থা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমুদায় ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী-ঘরের স্ত্রীলোকরা নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা কিরূপ নীরবে সহিষ্ণুতা-সহকারে সহ্য করে, যাহা সাধারণতঃ পুরুষদিগের চক্ষে পড়ে না—এই সকল কাহিনী গিরিশচন্দ্র নিপুণতার সহিত অতি নিখুঁতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি এরূপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্যসকল স্পষ্টভাবে সকলের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন যাহা অধ্যয়নকালে হৃদয়ে গভীর বেদনাসূচক রেখাপাত করে।

"বেল্লিক বাজার" (যাহাকে সাধারণ লোকে পঞ্চরঙ বা হাস্যোদ্দীপক কাব্য বলে তাহা) একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজের যতগুলি দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়া আছে তৎসমুদায়কে তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া কঠোর ভর্ৎসনা, ব্যঙ্গ ও তিরস্কার করিয়াছেন। এমন কি, দুষ্ক্রিয় ব্যক্তিদিগের কঠোর দণ্ডস্বরূপ তিনি মেথর দ্বারা ঝাঁটা-জুতা মারিয়াছেন। ইহাই যেন তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড। সামাজিক নাটকে তিনি একদিকে যেমন বিশ্লেষণ করিয়া সমস্ত দুর্নীতি দর্শাইয়াছেন, অপরদিকে তেমনি তাহার প্রতিকারও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। "বেল্লিক বাজার" নাটকের শেষ কথা হইল, "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত কভু জাগে না, জাগে না।" এইরূপে সামাজিক নাটকে তিনি সমাজ-

শরীরের মঙ্গলের জন্য গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল চিন্তারাশি নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈরাগ্যমূলক নাটক, যথা—বিল্বমঙ্গল, শঙ্করাচার্য্য, পূর্ণচন্দ্র, বুদ্ধদেব, তপোবল ইত্যাদি। এই সকল নাটকে তিনি জ্ঞান-মার্গের উচ্চতত্ত্ব সকল জনসাধারণের বোধগম্যের জন্য সরল ভাষায় নানা রসতত্ত্বের ভিতর দিয়া সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলি চরিত্র-অঙ্কনের নিপুণতার ফলে অত্যন্ত সরল হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানমার্গের উচ্চ-স্তরের সাধকের সংস্পর্শে না আসিলে এরূপ কাব্য রচনা করা সম্ভবপর নহে। গিরিশচন্দ্র দর্শনশাস্ত্র কিরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিলেই বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

ভক্তিমূলক নাটক, যথা—চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, রূপ-সনাতন প্রভৃতি বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। দার্শনিক কাব্যে যেমন তিনি গভীর দার্শনিক ভাব দর্শাইয়াছেন ভক্তি-কাব্যেও তেমনই তিনি প্রগাঢ় ভক্তিভাব প্রচার করিয়াছেন। অনেক স্থলে পড়িতে গেলে মনঃপ্রাণ পূর্ণমাত্রায় ভক্তলোক হইয়া যায়, তখন মন আর অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হয় না। গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যখন যে ভাব প্রকাশ করিতেছেন তখন দর্শকের বা পাঠকের মনে স্বতঃই উদয় হয় যে ইহাই যুক্তিযুক্ত সঠিক শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, গিরিশ-চন্দ্রের চরিত্রগুলি 'ইতি-পদবাচ্য' (Positive)। চরিত্র-চিত্রণে তিনি 'নেতি-পদবাচ্য' ভাব (Negative idea) বিশেষ প্রচার করেন নাই। তিনি বিশেষভাবেই জানিতেন যে, নেতি-পদবাচ্য

ভাব প্রচার দ্বারা ব্যক্তি বা জাতি বলিষ্ঠ হইয়া উঠে না। এইস্থলে একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবসমূহ ইতি-পদবাচ্য—তিনিও নেতি-পদবাচ্য ভাব পছন্দ করিতেন না। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব' চরিত্র, 'শঙ্করাচার্য্য' চরিত্র, 'নিমাই' চরিত্র, পাঠ বা অধ্যয়ন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কবি যখন যে ভাবটি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তখনই তাহার প্রাধান্য বা পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়াছেন। ধর্ম্মজগতে পন্থা বা মার্গ হইল গৌণ, শ্রদ্ধা হইল মুখ্য। কারণ সাধক যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে যে 'পন্থা'ই অবলম্বন করুক্ না কেন তাহার ইষ্ট দর্শন হইবেই, কিন্তু সে যদি শ্রদ্ধাহীন হয় তাহা হইলে 'পন্থা' তাহার কোন উপকারেই আসিবে না। 'সাধক' চরিত্র অঙ্কনে গিরিশচন্দ্র এই অমূল্য সম্পদ্‌টি বিশেষভাবে নির্ণয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

জনা, চণ্ড ও সৎনাম নাটকে দেশাত্মবোধক ভাব বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। দেশের কল্যাণের জন্য দেশের উন্নতির জন্য তাঁহার মনটা কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তিনি উপাখ্যান দ্বারা সেই হৃদ্‌গত ভাবটিই প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার একমাত্র কারণ হইতেছে যে দেশাত্মবোধক ভাব, স্বাধীনতা-প্রয়াস ভাব ইহার ভিতর প্রদীপ্ত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও ছত্রপতি-শিবাজী গ্রন্থে জাতির উত্থান-পতন কিরূপে হয়, জাতির ভিতর কিভাবে শক্তি সঞ্চার হয়, উচ্চ-কার্য্যের জন্য জাতির কিরূপ অভ্যুত্থান ও অভ্যুদয় হয়, সেই সব বিষয় তিনি উপাখ্যান দিয়া দর্শাইয়াছেন। মহাভারত ও টডের রাজস্থান হইতে যে সকল আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন

তাহাদিগের প্রত্যেকটির ভিতরই আত্মপ্রবুদ্ধ ভাব, দেশাত্মবোধক ভাব ও বীর্য্যপ্রদ ভাব তিনি পূর্ণভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক নাটক তিনি প্রচলিত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনেক স্বতন্ত্র করিয়াছেন। ঐতিহাসিক নাটক ও দেশাত্মভাবাপন্ন নাটকের ভিতর দিয়া তিনি জাতি-গঠনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। সেইজন্য সেই সকল নাটকের ভিতর আত্মনির্ভর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক ও অধ্যবসায় ভাব বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রাণে যে একটা দৃঢ় বেদনা ছিল, এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠে তাহা পরিলক্ষিত হয়। ইহা কবির কল্পনা নহে, ইহা গভীর চিন্তাশীল দার্শনিকের চিন্তাপুঞ্জের প্রতীক।

উপসংহারে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, গিরিশচন্দ্র একজন মহাশক্তিমান্ মনীষী ছিলেন। এরূপ শক্তিমান্ নাট্যকার ও কবি জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, বাঙ্গালা ভাষার জীবন্ত অভিধান; ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নূতন প্রবর্ত্তক; মহাভক্তিমান্ নর-সিংহ। ভাস্করসম তেজ লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন—বাঙ্গালী জাতির ভিতর, বাঙ্গালা কাব্যের ভিতর ভাস্করসম তেজ তিনি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সমাজের, জাতির মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য, জাতিকে প্রাণবন্ত, জীবন্ত, জাগ্রত করিবার জন্য যে সমস্ত গভীর চিন্তা তিনি করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি নেত্রবারি দিয়া কয়েকখানি নাটক-রূপে রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। নূতন জাতি, নূতন ভাব, নূতন উত্তম, নূতন উৎসাহ, নূতন প্রচেষ্টা, নূতন ভাষা, নূতন শব্দ, নূতন ছন্দ, নূতন অলঙ্কার—ইহাই হইল তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা। ইহাতে তিনি কতদূর সফলকাম হইয়াছেন তাহা কিছু কাল পরে বুঝিতে

পারা যাইবে ; কারণ এত প্রকার ভাবরাশি ও জীবন্ত শক্তিমান্ চরিত্র সমাজ ও দেশ অল্পদিনের ভিতর গ্রহণ করিতে পারে না, সমাজে বা জনচিত্তে প্রবেশ করিতে তাহাদের সময় লাগিবে। কিন্তু তাঁহার প্রণোদিত পন্থা যে সফলকাম হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। জাতি যত স্বাবলম্বী হইবে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার সৌন্দর্য্য তত উপভোগ্য হইবে। তুচ্ছ বস্তু বা কার্য্যের ভিতর যিনি মহান্‌কে দেখিতে পান তিনিই হইলেন মহৎ লোক। গিরিশচন্দ্রের জীবন ও রচনা-প্রণালীতে এই ভাবটি অতি স্পষ্ট ও নিখুতভাবে বিকশিত হইয়াছে ; সেইজন্য তাঁহাকে আমি মহৎ ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করি। তাঁহার তুলনা তিনি স্বয়ং ; তাঁহার রচনা বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। তিনি নাম-যশের কাঙাল ছিলেন না ; তাঁহার জীবনের আকাঙ্ক্ষা তিনি নিজেই রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন :—

"ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি আপনি শুকায়ে যায় !
মৃত্যুভয়
আছে কি কুসুমে ?"